Registration No.: SO197407 of 2012-2013

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

পঞ্চম বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖জুন ২০২৫

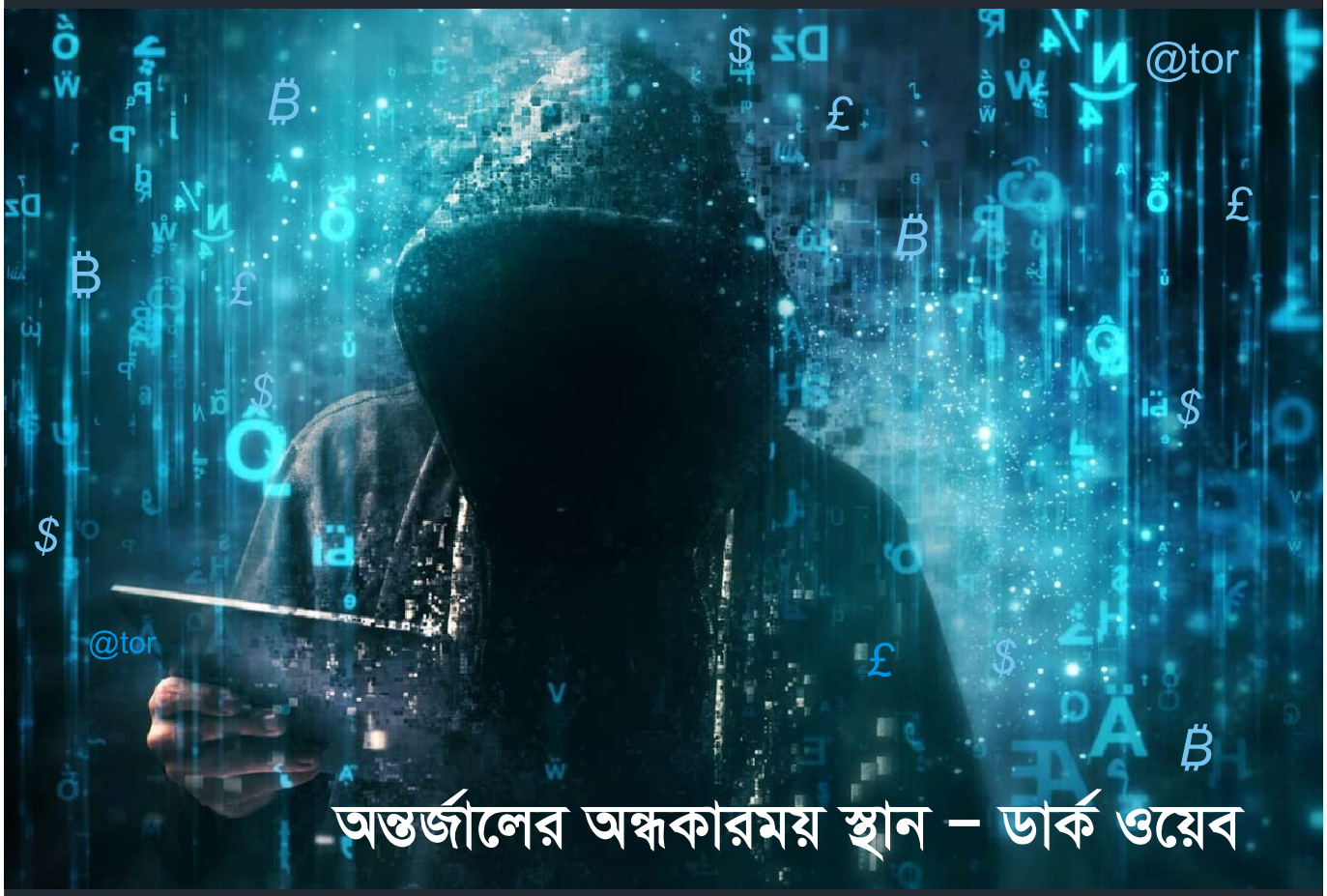

অন্তর্জালের অন্ধকারময় স্থান – ডার্ক ওয়েব

সম্পাদকীয় ঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসঙ্গে
রিপোর্ট ঃ বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র ৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন
পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ পৃথিবী জুড়ে কি সমুদ্রের জলতল উপরে উঠে আসছে?
স্মরণে ঃ বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার
ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

পঞ্চম বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖জুন ২০২৫

ঃ সূচিপত্র ঃ

◈ সম্পাদকীয় ঃ ২

◈ রিপোর্ট ঃ ৬
◆বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র ... প্রকাশ্য অধিবেশন
◆নারী নির্যাতন ও হত্যার ন্যায়বিচারের লড়াই

◈ বিশেষ রচনা ঃ ১০
◆অন্তর্জালের অন্ধকারময় স্থান – ডার্ক ওয়েব

◈ পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ ১৩
◆পৃথিবী জুড়ে কি সমুদ্রের জলতল উপরে উঠে আসছে?

◈ স্মরণে ঃ ১৭
◆বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার

◈ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ ১৯
◆খনিজ-আকরিক অনুসন্ধানের পথিকৃৎ প্রমথনাথ বসু

◈ প্রশ্ন ও উত্তর ঃ ২২
◆চোখে কেন জল?
◆বেশিরভাগ পুরুষ মহিলাদের চেয়ে লম্বা কেন?

◈ সমাজ দর্পণ ঃ ২৪
◆অনুপ্রেরণার অন্য নাম – ছোনজিন আংমো
◆"বিজ্ঞান শিখি, তবু ভূতের ভয়"!
◆চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের গান
◆জাল ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে

◈ বিজ্ঞানের খবর ২৬

◈ সমাজ বিজ্ঞান ঃ ২৮
◆দৈহিক শ্রম কি মানসিক শ্রম থেকে আলাদা?

◈ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ ৩১
◆মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

◈ সংগঠন সংবাদ ৩৮

◈ ছড়া ঃ ৩৯
◆মাস হিস্টিরিয়া

সম্পাদকীয় ঃ

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রসঙ্গে

পৃথিবী সহ মহাবিশ্ব বস্তুময়। বস্তুজগৎ গঠিত হয়েছে পদার্থ ও শক্তির সমন্বয়ে। বস্তুজগতের প্রত্যেক উপাদানের কিছু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের সংস্পর্শে বা প্রভাবে এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু নির্দিষ্ট উপাদানটির মৌলিক পরিচয় হল তার ঐ চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য। একেই আমরা তার **'ধর্ম'** বলি, যার ইংরেজি হল Property (প্রপার্টি)। জীব ও জড় সমস্ত বস্তুরই ধর্ম বা প্রপার্টি আছে। অতএব মানুষেরও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে। অভিযোজিত হওয়ার ক্ষমতা, অনুসন্ধিৎসা, উদ্ভাবনী দক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম, সঙ্ঘবদ্ধতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এককথায় যা দাঁড়ায় তা-ই হল **মানবিকতা**। কিন্তু মানুষকে কেবলমাত্র উপরোক্ত 'ধর্ম'গুলি ও তার সাধারণরূপ মানবিকতা দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না। কারণ সভ্যতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে মানব সমাজ নিজের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। সকল জাতি, সকল ভাষা, সমস্ত নৃগোষ্ঠীর মানব সমাজে এই শ্রেণী বিভাজন বিনা ব্যতিক্রমে এক অনিবার্য চরিত্রবৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। সুতরাং কোন মানুষ শ্রেণী বিভাজনের কোন্ দিকে বাস্তবে অবস্থান করছেন তার দ্বারাই তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয়। একজন দাস মালিক আর তার ক্রীতদাস, রাজা ও ভূমিদাস এবং আধুনিক যুগে এক ধনকুবের পুঁজিপতি ও একজন শ্রমিকের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অর্থাৎ 'ধর্ম' এক হতে পারে না।

কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ অন্য আরেক ধরনের 'ধর্ম' পরিচয় দ্বারাও পরিচিত হন। বলা ভাল এই প্রকার **ধর্ম** পরিচয়টার সাথেই বেশিরভাগ মানুষ সংশ্লিষ্ট। এই ধর্মের ইংরেজি হল – **রিলিজিয়ন**। এই শব্দটি লাতিন religio (রিলিজিয়ো) থেকে আসলেও তার ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পন্ডিতদের নানা মত রয়েছে। যাই হোক বর্তমান যুগে রিলিজিয়ন বা ধর্মের অর্থ দাঁড়ায় বিশ্বাস ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট মান্য প্রথার এক ব্যবস্থা। যা মূলতঃ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও তার সঞ্চালন সম্পর্কে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি সমূহের ভূমিকার সাথে সংশ্লিষ্ট। এই বিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট মান্য প্রথাগুলি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মহাদেশে ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুসংগঠিত রূপ ধারণ করেছে। গড়ে তুলেছে নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শক্তিকাঠামো এবং অনুগত জনসমুদায়। জরাথুস্টবাদী (পারসি), হিন্দু (এখন বলা হচ্ছে সনাতনী), জৈন,

বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম ইত্যাদি ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস, প্রথা, প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং অনুগত জনসমুদায়ের দিকে নজর দিলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

অতএব শ্রেণীগত বিভাজন এবং রিলিজিয়ন ('ধর্ম') গত বিভাজন মানব সমাজের বিকাশের গতিপথে অর্জিত বৈশিষ্ট্য – মানব প্রজাতির আবির্ভাবের সাথে অচ্ছেদ্য, মৌলিক চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়।

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন আসে যে এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা আধিপত্যকারী এবং দুইয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কই বা কি?

এই দুইয়ের উৎস ও বিকাশের ধারা বর্তমান পরিসরে সবিস্তারে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও সংক্ষেপে আলোকপাত করা যায়।

ব্যাখ্যার অতীত প্রাকৃতিক শক্তি এবং শক্তিশালী (হিংস্র, ঘাতক) জীবজন্তুকে নাচ-গান এবং 'উপঢৌকন' দ্বারা তুষ্ট করার রীতি-প্রথা প্রতিটি আদিম মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে (যার অবশেষ এখনো দেখতে পাওয়া যায়)। ঐ সময় সমাজ ছিল সাম্যতান্ত্রিক। সামান্য হলেও যা কিছু সম্পদ তার সমষ্টিগত উপভোগ হত। সম্পদের মালিকানা ব্যক্তিভিত্তিক ছিল না।

ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশ এবং 'পরিবার' সৃষ্টির সাথে সাথে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার উত্তরাধিকার জন্ম দিয়েছে মুষ্টিমেয় মালিক এবং সুবিপুল সংখ্যায় গোলামের। মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার এবং সুবিপুল গোলামশ্রেণীকে বশে রাখার জন্য উদ্ভুত হয়েছে আপাতভাবে 'নিরপেক্ষ' রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটির। ঐতিহাসিকভাবে রাষ্ট্র এবং আধিপত্যকারী ধর্মীয় সংগঠন গভীর বন্ধনে আবদ্ধ থেকেছে। আধিপত্যকারী ধর্মীয় সংগঠনের কথা এই জন্য আসে যে 'রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম' এটাই ছিল স্বীকৃত। মধ্যযুগ পর্যন্ত পররাজ্য গ্রাস, নিজ রাজ্যের সুরক্ষা, শোষিত-নিপীড়িতদের প্রতিবাদ ও তার উপর হিংস্র দমন সব কিছুই ধর্ম প্রসার, ধর্ম রক্ষা, ধর্ম যুদ্ধের আবরণে সক্রিয় হত। তথাকথিত একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ধারা বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সংঘাত 'বিধর্মী'দের মধ্যেকার সংঘাতের থেকে কম হিংস্র ছিল না। ভারতীয় ভূখন্ডে 'হিন্দু' ধর্মের সাথে বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংঘাত থেকে শাক্ত-শৈব বা বৈষ্ণবদের মধ্যেকার লড়াই কম হিংস্র ছিল না, খ্রিষ্টানদের ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শিয়া, সুন্নি ইত্যাদি ধারার মধ্যে বিরোধ এরই প্রমাণ। সকল ক্ষেত্রেই রাজধর্ম রাষ্ট্রের মদতে পরিপুষ্ট হয়েছে। 'বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার ...' কাব্যের পংক্তি সত্যকেই প্রতিফলিত করে।

প্রাচীন যুগ থেকেই যে দর্শন, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব – ধর্মীয় স্বতঃসিদ্ধ, দর্শন, প্রথা, আচার ইত্যাদির বিরোধিতা করেছে বা বিরোধী মতকে তুলে ধরেছে রাষ্ট্র তাদের নির্মমভাবে দমন করে ধর্মীয় কাঠামোর নেতৃত্বের হাত শক্ত করেছে। সুতরাং ঐতিহাসিকভাবেই রাষ্ট্র, ধর্মের সাথে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে রাষ্ট্র আধিপত্যকারী (সাধারণভাবে সংখ্যাগুরুর) ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে এসেছে।

বিজ্ঞানের বিকাশ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিজ্ঞানের বিকাশগুলিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তনের ধারক-বাহক শক্তিগুলি সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক কাঠামোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। পশ্চিম ইউরোপে এই পরিবর্তন সবচেয়ে আগে পরিলক্ষিত হয়েছিল। অতএব রাজতন্ত্র ও গির্জা দুইয়ের সম্মিলিত প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হয়েছিল প্রবলভাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ফরাসী বিপ্লবের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে রাজতন্ত্রকে উৎখাতের সাথে সাথে ধর্মতান্ত্রিক কাঠামোয় চরম আঘাত হানা হয়েছিল। এমনকি ফরাসী অভিধান থেকে ধার্মিক ও ধর্মবিষয়ক শব্দাবলী বাতিল করে দেওয়া হয়।

কিন্তু বাস্তব কারণেই এই প্রক্রিয়া স্থায়ী হয়নি। ফরাসী বিপ্লবের নেতৃত্বদায়ী শ্রেণী ছিল শিল্পীয় মালিক পুঁজিপতিশ্রেণী। তাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থাও রাজতান্ত্রিক শাসনের মতোই মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর দ্বারা ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের (এক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর) উপর চাপিয়ে দেওয়া শোষণ ভিত্তিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে এই বিপ্লবের প্রধান লড়াকু শক্তি ছিল শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবীরা। মূলতঃ তাদের নেতৃত্বদায়ী সচেতন অংশই পুরনো রাজতান্ত্রিক শাসনের সাথে তার যাবতীয় দার্শনিক ও ধার্মিক ভিত্তিগুলিকে উপড়ে ফেলতে দায়বদ্ধ ছিল।

ফরাসী বিপ্লব দুনিয়ার নবোত্থিত মালিকশ্রেণীর কাছে একটা বার্তা সুস্পষ্টরূপে প্রেরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। ব্যাপক সংখ্যাধিক শ্রমিকদের বশে রাখতে গেলে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দর্শন-সংস্কৃতি-ধর্মতত্ত্বকে সার-জল দিয়ে সজীব রাখতে হবে। এজন্য ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীতে দুনিয়ার কোন দেশের রাজতান্ত্রিক শাসনকে সমূলে উৎপাটিত করে শিল্পীয় মালিক পুঁজিপতিশ্রেণী 'বিপ্লব' সম্পন্ন করতে এগিয়ে আসেনি। সংস্কার ও সমঝোতার মাধ্যমে নিজেদের ব্যবস্থা কায়েম করেছে।

রাজতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাতশ্রেণীও সমঝোতা করে নিজের ভাগটুকু নিশ্চিত করার দিকে মন দিয়েছে। এজন্যই ইউরোপের আধুনিক দেশগুলিতেও জনপ্রতিধিত্বমূলক 'পার্লামেন্ট' এর সাথে রাষ্ট্রের দায়িত্বে রাজা-রাণী-রাজমহলের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় (বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে কয়েকটি রাষ্ট্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়)। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের সাথে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মস্থান-ধর্মসমাবেশ 'স্বমহিমায়' বিরাজমান থাকে। 'ধর্মপ্রাণ' ব্যক্তিরাও সামান্য যুক্তিপ্রয়োগ করলে দেখতে পাবেন ধনকুবের মালিকগোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রের অর্থ-প্রশাসন-ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন ধর্মীয় রীতি-প্রথা-সমাবেশ-অভিযান সম্ভব নয়। বাৎসরিক হজ এর সমস্ত দায় পালন করে সৌদি আরব। ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের কেন্দ্র ভ্যাটিক্যান তো নিজেই রাষ্ট্র। অমরনাথ যাত্রা থেকে দুর্গাপুজো কোন্‌টা রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও মদত ছাড়া অনুষ্ঠিত হয়?

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ার কারণ কি?

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ শব্দটি ইংরেজি সেকুলার শব্দের বাংলা তর্জমা। **সেকুলার এর ইংরেজি অভিধানগত অর্থ হল ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন।** প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হল সমস্ত ধর্ম ও ধর্মানুগামীদের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিমানুষ ধর্মবিশ্বাসী হলে কোন একটি ধর্ম বা রিলিজিয়নে বিশ্বাস করেন। তার প্রথা সোচ্চারে বা নিরুচ্চারে মেনে চলেন। ধর্মবিশ্বাসের প্রাবল্য অনুযায়ী তাকে ধার্মিক-ধর্মপ্রাণ ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি অন্য ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পন্ন হবেন এমনটা বাস্তব নয়। যিনি ধর্মবিশ্বাসী নন তিনিই একমাত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারেন। যাই হোক 'সেকুলার' শব্দটি ব্যক্তিমানুষের থেকেও রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বর্তমান আধুনিক যুগের রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রের মালিকশ্রেণীর মধ্যে যে ধর্মাবলম্বী বা সংখ্যাগুরু সেই ধর্মই কার্যত রাষ্ট্রধর্ম। (কাগজে কি লেখা আছে তার দ্বারা তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা নির্ধারিত হয় কার্যক্ষেত্রে-ব্যবহারে।) কিন্তু সমস্যা হল একটি মাত্র ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে প্রায় কোন রাষ্ট্রই গঠিত নয়। তার অবশ্যম্ভাবী ফল হল কেবল ধর্মাচরণ নয় শিক্ষা-জীবিকা-ব্যক্তিগত আচরণ-খাদ্যভ্যাস-পোশাক-বিবাহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু ধর্মের আধিপত্য, দখলদারি কায়েমের জন্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া এই বিদ্বেষ অভিযান সংগঠিত করে সংখ্যাগুরু ধর্মান্ধ বাহিনী। সেটাও রাষ্ট্রের (আইন-পুলিশ-প্রশাসন) প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা ছাড়া সংগঠিত হয় না। একইভাবে সংখ্যালঘু ধর্মভুক্তদের এর প্রতিরোধে ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয় এবং একাংশকে পাল্টা প্রতিরোধ অ্যাকশনে সামিল করা হয়। এই প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর চলতে থাকে ও বৃদ্ধি পায়। কেবল একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নয় – বৈদেশিক ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-যুদ্ধের উৎস বা ভিত্তি যাই হোক না কেন জনগণকে সামিল করার জন্য তাতে ধর্মীয় মোড়ক দেওয়া হয়। ভারত-পাকিস্তান হলে হিন্দু-মুসলমান, আমেরিকা-ইরাক বা আমেরিকা-আফগানিস্তান হলে খ্রিষ্টান বনাম মুসলমান, সাম্প্রতিক ইসরায়েল-প্যালেস্তাইন বা ইসরায়েল-ইরান হলে মুসলিম বনাম ইহুদি ইত্যাদি। স্মরণে রাখা দরকার কিছু রাষ্ট্র ঘোষিতরূপে ধর্মবাদী। রাষ্ট্র ধর্মের অনুগামী নয় এমন নাগরিকরা বৈধরূপেই সমান অধিকারের দাবিদার নন। আবার কিছু রাষ্ট্র ঘোষিতরূপে ধর্মবাদী নয়। যেমন – ভারত।

যাই হোক রাষ্ট্রের দ্বারা ধর্মবিভাজন-ধর্মবিদ্বেষ টিকিয়ে রাখার বস্তুগত কারণ জানা সত্ত্বেও অনেক সংবেদনশীল 'উদারনীতিক' বুদ্ধিজীবীরা এবং সেই চিন্তাধারায় সঞ্চালিত রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ ধর্মীয় বিভাজন ও বিদ্বেষের প্রশ্নে রাষ্ট্রের এমন 'নগ্ন' ভূমিকা চান না। তাঁদের দাবি বা আকাংখা হল রাষ্ট্রকে সকল ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে – এই অর্থে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারত

ব্রিটিশ শাসনের অধীন অবিভক্ত ভারতকে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছিল – ভারত ও পাকিস্তানে। এই বিভাজনের ভিত্তি ছিল ধর্ম। সংবিধান সভা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর যে সংবিধান চূড়ান্ত করে (যা কার্যকরী হয় ১৯৫০ এর ২৬শে জানুয়ারি) তাতে ভারতকে সেকুলার বলে ঘোষণা করা হয়নি। আবার হিন্দুত্ববাদী রূপেও চিহ্নিত করা হয়নি। বরং সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জরুরি অবস্থা চলাকালে (প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেসের ইন্দিরা গান্ধী) সংবিধানের প্রস্তাবনায় লক্ষ্য রূপে 'সেকুলার' শব্দ যুক্ত করা হয়। সেই সময় সংসদে আলোচনা চলাকালে যে ব্যাখ্যা উঠে এসেছিল তার সার কথা ধর্ম বা ঈশ্বর বিরোধী নয়। এই সেকুলার এর অর্থ সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অতএব সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা 'সেকুলার' শব্দের দ্বারা রাষ্ট্র ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে এমন ধারণা করা অবাস্তব।

বর্তমান ভারতে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন সেই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং তাদের মতাদর্শগত কর্তৃত্ব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) ঘোষিতরূপেই হিন্দুত্ববাদী। তাদের লক্ষ্য ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রের পরিণত করা। তাদের রাজত্বে

'সেকুলার' একটি গালাগালে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে যারা বর্তমান রূপের সেকুলারবাদে আস্থা রাখেন তাঁরা বলছেন সংবিধানপ্রদত্ত সেকুলারবাদকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

যদি কোন পূর্ব ধারণার বশবর্তী না হয়ে বাস্তবের দিকে তাকানো যায় তবে দেখা যাবে ধর্মের ভিত্তিতে খন্ডিত ভারত রাষ্ট্র প্রথম দিন থেকেই কার্যতঃ হিন্দুরাষ্ট্র। তথাকথিত সেকুলারবাদী জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মুখ্য ধারা ছিল কট্টর হিন্দুত্ববাদী। হিন্দু মহাসভার নেতারা জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। অন্যদিকে তথাকথিত সেকুলারবাদী মুসলিম নেতৃত্ব এদেরই দাপটে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগের শরণ নিয়েছিল।

যাই হোক ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে অগণিত উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় ১৯৭৬-এর (অর্থাৎ 'সেকুলার' চিহ্নিত হওয়ার) আগে অথবা পরে, তথাকথিত সেকুলারবাদীদের শাসন ক্ষমতায় অথবা বর্তমানের হিন্দুত্ববাদীদের রাজত্বকালে রাষ্ট্র এবং ন্যায়ালয় ও তার অন্যান্য স্তম্ভগুলি সেকুলারবাদী নয় সংখ্যাগুরু ধর্মবাদী ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে সর্বাপেক্ষা গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে যে বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কের মাধ্যমে সেটা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। শুরুতে বিতর্ক ছিল বাবরি মসজিদ যে জমির উপর, তার মালিকানা নিয়ে আদালতী মামলা। সেই মামলায় আদেশ হল মসজিদ তালা বন্ধ করে দিতে হবে। সেই বন্ধ মসজিদের তালা খুলে মসজিদের ভেতর হিন্দুদের রামলালার পুজো করার সুযোগ করে দিল ফৌজদারী আদালত। এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের রাজীব গান্ধী। এর পরই বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে তার ধ্বংসাবশেষের উপর রামমন্দির গড়ার রণহুঙ্কার দেয় আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি। ১৯৯২-তে বাবরি মসজিদ ভেঙে তার ধ্বংসাবশেষের উপর অস্থায়ী রাম মন্দির স্থাপন করার সময় উত্তর প্রদেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার থাকলেও প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে জড়ো করার জন্য দেশব্যাপী অভিযান থেকে ধ্বংসকার্য – দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল কেন্দ্রের নরসীমা রাও নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার। বিজেপি'র প্রধান নেতারা ভাষণ দিয়ে মসজিদ ভাঙতে উস্কানি দিয়েছিল। সেই দৃশ্য টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হলেও আদালতের চোখে তারা নির্দোষ সাব্যস্ত হন। আদালতই নির্দেশ দেয় ধ্বংসাবশেষের উপর অস্থায়ীভাবে নির্মিত রামমন্দিরকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব উত্তরপ্রদেশ সরকারের। শুরু হয় নতুন ও স্থায়ী মন্দির গড়ার প্রস্তুতি। রামমন্দির গড়ার ধর্মীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি নির্বাচনী প্রচার চালালেও তা আদালতের বিচারে অবৈধ হলেও না নির্বাচন কমিশন না আদালত – কেউ কোন বাধা দেয়নি। অতঃপর সর্বোচ্চ আদালতের 'ঐতিহাসিক রায়'! বাবরি মসজিদ ভাঙা অপরাধমূলক কাজ। কিন্তু সেই অপরাধীপক্ষের হাতেই ঐ জমি তুলে দেওয়া হবে মন্দির নির্মাণের জন্য। এজন্য ট্রাস্ট গড়ার দায়িত্ব সরকারের উপর অর্পণ করা হয়। বিচারপতিদের শিরোমণি নিজেই অবসরের পর জানিয়েছেন তিনি রায়দানের আগে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। বলা বাহুল্য সেই ঈশ্বর সেকুলারবাদী নন।

অতি সম্প্রতি উচ্চ আদালতের এক বিচারক প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সভায় সংখ্যালঘুদের প্রতি অপশব্দ ব্যবহার করে বলেছেন সংখ্যাগুরুর ইচ্ছেতেই দেশ চলবে।

মনে রাখতে হবে এখনো ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' শব্দটি উৎকীর্ণ আছে।

পরিশেষে যেটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন সেটা হল যতদিন পর্যন্ত মুষ্টিমেয়র স্বার্থে ব্যাপককে শোষণের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান ও সচল থাকবে ততদিন কোন অর্থে রাষ্ট্র 'সেকুলারবাদী' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী' হতে পারে না। মুষ্টিমেয়র শাসন টিকিয়ে রাখতে ব্যাপকের মধ্যে ধর্মভিত্তিক বিভাজন তৈরির ব্যবস্থা করতেই হবে।

অন্যদিকটিও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্র ধর্মতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয় না। যারা দেশের মধ্যে সংখ্যালঘুদের 'মঙ্গলসূত্র' হরণকারী বলে প্রচার করেন তাঁরাই আবার নিঃসঙ্কোচে আরব শেখদের আলিঙ্গন করে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসায়িক চুক্তি করেন। বিষয়টা উল্টোদিক থেকেও সত্য, রাষ্ট্র পরিচালিত হয় মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর স্বার্থে। তার অর্থনীতি-রাজনীতির স্বার্থে। সাধারণ জনগণও প্রধানতঃ শোষিত-নিষ্পেষিত হন অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা। এজন্যই যে কোন প্রকার শোষণ-দমন-অত্যাচার বিরোধী আন্দোলন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যাপকের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। এই ধরনের তৎপরতাই আগামী দিনের শোষণ রহিত সমাজ নির্মাণের ভিত্তি স্থাপন করে। শ্রেণীগত শোষণ যদি না থাকে মুষ্টিমেয়র দ্বারা ধর্ম বিদ্বেষ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তাও শুকিয়ে যায়। তার আগে পর্যন্ত 'অশুভ' বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কর্তব্য সামনে এসে দাঁড়ায়। ■

রিপোর্ট ঃ

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র ৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন

গত ১লা জুন ২০২৫ কলকাতার সুবর্ণ বণিক সমাজ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র ৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন। এই অধিবেশনে বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের প্রতিনিধিগণ, আর জি কর আন্দোলনের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা অভয়া মঞ্চ, রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কর্মরত ডাক্তারদের সংগঠন হেলথ সার্ভিসেস এ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল এর প্রতিনিধিরা। এছাড়া বিজ্ঞান ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত বক্তব্য রাখেন। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানমনস্কের সদস্য, অন্যান্য সংগঠনের সদস্য, বহু বিজ্ঞানপ্রেমী ও শুভানুধ্যায়ীদের সমাগম ছিল যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক।

প্রথমে বিজ্ঞান মনস্ক পশ্চিমবঙ্গ'র সাধারণ সম্পাদক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশনের সূচনা করেন। অধিবেশন শুরু হয় বিজ্ঞান আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ও যেসব বিজ্ঞানীর বিগত দিনে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের স্মরণে শ্রদ্ধায় মৌনতা পালনের মধ্য দিয়ে।

এরপর এক সদস্য উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অধিবেশনে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে লিখিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সেই প্রতিবেদনে বর্তমান পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ ও সংগঠনের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে বিজ্ঞান মনস্ক'র দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা হয়। যার মূল কথা, বিজ্ঞান আন্দোলন তথা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের আন্দোলন সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিপরীতে এর সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্কিত। এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে আগামীতে বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেই লক্ষ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কর্তব্য তুলে ধরা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

এরপর এই প্রতিবেদনের উপর বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের তরফে আলোচনা উঠে আসে। বেশিরভাগ প্রতিনিধি প্রতিবেদনের সাথে সম্পূর্ণ সহমত প্রকাশ করেন। সেইসাথে তাঁরা তাঁদের সংগঠনের কর্মসূচি ও সেই কর্মসূচির বাস্তবায়নে কী কী বাধা আসছে এবং সেই বাধা দূর করতে কী কী সফল পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নেওয়ার কথা ভাবছেন তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।

সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় (অভয়া মঞ্চ), ডাঃ অশেষ রায়চৌধুরী (ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ), সুকান্ত হালদার (প্রগতিশীল যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, গাববেড়িয়া), ডঃ অরুণাভ মিশ্র (অধ্যাপক, বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞান সংগঠক), অরূপ কুমার দে (বিজ্ঞানকথা), ডাঃ পূন্যব্রত গুণ (শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, অভয়া মঞ্চ'র আহ্বায়ক), ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার (পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট PASE), ডঃ অর্ণব সেনগুপ্ত (হেলথ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল), সুমিত মণ্ডল (নড়িদানা স্বপ্নসন্ধান), রাইচরণ ব্যানার্জি (গরলগাছা সায়েন্স ক্লাব), দেবাশিষ ভট্টাচার্য (ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি) এবং ভাস্কর ঘোষ (ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি)। এছাড়া বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষ থেকে পম্পা নায়েক ও সুপ্রিয়া মাঝি বক্তব্য রাখেন।

সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিনিধিদের বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ–

ডাঃ উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিজ্ঞান আন্দোলনকে সামগ্রিক সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার উত্তর আধুনিক তত্ত্বের বিরোধিতা করেন এবং এবিষয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করেন। এছাড়া তিনি বলেন, শাসক পরিবর্তন নয় ব্যবস্থাটাকে আমরা পাল্টাতে পারছি কিনা সেটা হল মুখ্য বিষয়। জার্মানির ওই দাঁড়িওয়ালা মানুষটি বলে গিয়েছিলেন দার্শনিকরা বিভিন্নভাবে দুনিয়াটাকে ব্যাখ্যা করেন কিন্তু আসল কথা হল এর বদল হবে কিভাবে সেই দিকে অগ্রসর হওয়া।

ডাঃ অশেষ রায়চৌধুরী ঃ প্রতিবেদনের সাথে সহমত ব্যক্ত করে বর্তমানে বিজ্ঞান আন্দোলনের বাধা অতিক্রম করার আহ্বান রাখেন। প্রতিবেদনের সমর্থনে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়নের মাধ্যমে কিভাবে পাঠক্রম থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কারগুলিকে হঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছাত্র সমাজ তথা সমাজের এক বৃহত্তর অংশকে অজ্ঞ রাখার জন্য। এই প্রসঙ্গে বক্তা বিবর্তনবাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, এখন চিকিৎসা ক্ষেত্রকে ক্লিনিক্যাল পর্যবেক্ষণের বদলে বহুল পরিমাণে ইনভেস্টিগেশন নির্ভর করে তোলা হয়েছে।

সুকান্ত হালদার ঃ প্রতিবেদনের সাথে সহমত জানিয়ে তিনি বলেন প্রতিবেদনে উল্লিখিত বিশ্ব মানব পরিবেশ দিবস থেকে 'মানব' কথাটা বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যা তাঁর ভালো লেগেছে। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থেই এটা করা হয়েছে। তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কুসংস্কার বিরোধী আইনের প্রসঙ্গে বলেন, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোনও রাজ্যে এই প্রকার আইন নেই।

ডঃ অরুনাভ মিশ্র ঃ প্রতিবেদন সম্পর্কে বলেন, এতে সমাজ বদলের ইঙ্গিত আছে এবং বিজ্ঞান মনস্ক একইসঙ্গে সমাজ মনস্ক এবং বস্তুবাদী। তিনি এও বলেন, রাষ্ট্র আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানকে মেলাতে চাইছে। ভারতীয় ঐতিহ্য বলে যা বলা হচ্ছে তা ভারতীয় ঐতিহ্য নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যেও যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী বহু ধারণা তিনি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন।

অরূপ কুমার দে ঃ সম্মেলনের প্রতিবেদনের প্রতি সহমত পোষণ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভাববাদী ধারণাকে বেশি মদত দিচ্ছে, তাই বিজ্ঞান প্রসার কমিয়ে ধর্মীয় ভাবধারার প্রসার ঘটাচ্ছে। তাই সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলা খুবই জরুরী।

ডাঃ পূণ্যব্রত গুণ ঃ তিনি বলেন বিজ্ঞান মনস্ক'র সঙ্গে তাঁর পরিচয় অভয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। এই সংগঠন সম্পর্কে তাঁর প্রথম ধারণা ছিল বিজ্ঞান মনস্ক হয়ত অন্যান্য বিজ্ঞান সংগঠনের মতোই একটি সংগঠন। এরপর ৮ই মার্চের আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসের একটি সভায় উপস্থিত হয়ে ভুল ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন 'বিজ্ঞান মনস্ক' চিরাচরিত বিজ্ঞান চর্চার বাইরেও সমাজ বিজ্ঞান ও সামাজিক আন্দোলন নিয়েও কাজ করে। সেদিন তিনটে নারী দিবসের সভায় উপস্থিত থেকে তিনি দেখেছেন একমাত্র বিজ্ঞান মনস্ক'র সভায় শ্রমজীবী নারীরাই তাঁদের সমস্যা নিয়ে বলছেন। একটি বিজ্ঞান সংগঠন হয়েও যেভাবে বিজ্ঞান মনস্কের সদস্যরা অভয়া মঞ্চের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তার প্রশংসা করেন।

ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার ঃ তিনি বলেন, সমাজকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা ছাড়া বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। সেইসাথে সব সংগঠন কীভাবে যৌথভাবে কাজ করতে পারে তার একটি রূপরেখা দেন।

ডাঃ অর্ণব সেনগুপ্ত ঃ তিনি বলেন, বিজ্ঞানের উপর আক্রমণ হচ্ছে। আঘাত আসছে বিজ্ঞানের পদ্ধতি এবং বিজ্ঞান দর্শনের উপর। ধীরে ধীরে মেডিকেল শিক্ষাকে স্কিল বা পদ্ধতি নির্ভর করা হচ্ছে কতগুলি টেকনোলজি এনে। মৌলিক গবেষণামূলক কাজ লুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান শিক্ষার বুনিয়াদি পদ্ধতি লুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে, শুধু বিজ্ঞান কংগ্রেস বন্ধ করে দেওয়া নয়, বিজ্ঞান ফান্ডিং কমানো হচ্ছে। গবেষকরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে বিজ্ঞানের ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাস গল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের জানানো দরকার। কত চোখের জল, কত কষ্ট, যন্ত্রণার বিনিময়ে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি হয়েছে। তিনি জানান, বিজ্ঞানের বহু পরিভাষা অক্ষয় কুমার দত্তের সৃষ্টি। শিক্ষা বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাছাই করে ভারতীয় ঐতিহ্যের অপবিজ্ঞান অবিজ্ঞানের দিকগুলিকে প্রচার করা হচ্ছে।

সুমিত মণ্ডল ঃ তাঁর নিজের এলাকায় বিজ্ঞান সচেতনতা প্রসারে তাঁর সংগঠনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বিজ্ঞান সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ নয়, তাই বিজ্ঞান মনস্ক'র ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাবকে সমর্থন জানান।

রাইচরণ ব্যানার্জি ঃ নিজ বিজ্ঞান সংগঠনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বলেন প্রতিবেদনে যা আছে তা যদি আমরা কার্যকরী করতে পারি তবে বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রসার হবে।

দেবাশিষ ভট্টাচার্য ঃ তিনি বলেন বিশ্লেষণটা সামগ্রিক হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞান সংগঠনের কাজটা সুনির্দিষ্টভাবে হওয়া উচিৎ না হলে বিষয়টা ছড়িয়ে যেতে পারে। পরিবেশ নিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র বক্তব্যে কিছু আগ্রহোদ্দীপক বিষয় আছে এবং কিছু বক্তব্যের বিষয়ে তাদের কিছু প্রশ্ন আছে।

●*শেষাংশ ৯ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

রিপোর্ট ঃ

পুরুলিয়া ঃ নারী নির্যাতন ও হত্যার ন্যায়বিচারের লড়াই – শত শত গ্রামবাসীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম প্রাথমিক জয় হাসিল করল

গত ৩রা জুন ২০২৫, সকালে পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার নারায়ণপুর গ্রামে নিজের শাড়ির ফাঁসে একটি গাছে ঝুলতে দেখা যায় মিঠাইমণি মাহাতোকে।

গরীব পরিবারে জন্ম হওয়া মেয়েকে বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিল মিঠাইমণি। তার বিয়ে হয়েছিল পুরুলিয়া জেলার মফস্বল থানার অন্তর্গত হুলকা গ্রামে। স্বামী রোজগারের জন্য বাইরে থাকতো। শাশুড়ি, দেওর এবং দেওরের স্ত্রী (জা) তাকে নিয়মিত অত্যাচার করতো। স্বামী অরূপ মাহাতো সব জানলেও কোন প্রতিবাদ করতো না এবং রোজগারের সব টাকা মায়ের হাতে তুলে দিত। নিঃসন্তান মিঠাইমণি সব অত্যাচার সহ্য করে সেলাই ইত্যাদি ছোটখাট কাজ করে নিজের হাতখরচা চালাতো।

গ্রামবাসীরা জানায় সম্প্রতি মিঠাইমণির স্বামী স্ত্রী-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা পাঠায়। সেই টাকা দাবি ক'রে শাশুড়ি, দেওর ও জা মিঠাইমণির উপর প্রবল অত্যাচার শুরু করে। মারধোর, গালিগালাজ, বিছানায় জল ঢেলে দেওয়ার মত ঘৃণ্য অত্যাচার চলতে থাকে। নিরুপায় হয়ে মিঠাইমণি গ্রামের হরিমন্দিরে এসে শুয়ে থাকে। সেখানেও সে রেহাই পায় নি। তাকে মন্দিরের থামে মাথা ঠুকে দেওয়া হয়। সে প্রাণ বাঁচাতে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পালিয়েও রক্ষা পায় নি। মারতে মারতে তাকে ফিরিয়ে এনে জোর করে বাপের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবা-মা'কে সঙ্গে করে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরার সময় মিঠাই এর মা-বাবাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পরদিন সকালেই নারায়ণপুর গ্রামে মিঠাইমণিকে 'সকল পাশবিক অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়ে' ঝুলতে দেখা যায়! জয়পুর থানা কোন প্রস্তুতি ছাড়াই 'আত্মহত্যা' ঘটেছে এমন অনুমান প্রকাশ করে দেহ ময়না তদন্তে পাঠিয়ে দেয়।

এই ঘটনা হুলকা গ্রামের সাধারণ মানুষ মেনে নিতে পারেন নি। তারা সমবেত হয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকেদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গ্রামবাসীকে সমবেত করে ন্যায়বিচার আদায়ের লক্ষ্যে জোট বাঁধার আহ্বান রাখেন।

ভিলেজ পুলিশ মারফৎ খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ এসে বলে মেয়েটির বাপের বাড়ি থেকে লিখিত অভিযোগ না করলে গ্রেপ্তার সম্ভব নয়। পুলিশের যুক্তিতে গ্রামবাসী, বিশেষতঃ মহিলারা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। ঘরে ঘরে শেষ দেখার প্রস্তুতি শুরু হয়।

৫ই জুন ময়না তদন্তের পর দেহ গ্রামে নিয়ে আসলে হুলকা এবং সংলগ্ন গ্রামের মানুষ গ্রেপ্তারির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করেন। পুলিশ হাজার চেষ্টা করেও গ্রামবাসী, বিশেষতঃ মহিলাদের টলাতে পারে নি। মহিলারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন 'তিনদিন ধরে অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েটি গাছে উঠে নিজে ফাঁসি নিতে পারে না। "এক্ষুনি মহিলা পুলিশ এনে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে হবে।" এরপর বাপের বাড়ির করা অভিযোগের ভিত্তিতে

মিঠাইমণির দেওরকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাকিদের গ্রেপ্তারির দাবিতে অবরোধ চলতে থাকে। থানা থেকে বড়বাবুরা এসে জনতাকে হুমকি দিয়ে বলে "রাস্তা অবরোধ বে-আইনী কাজ, রাস্তা না ছাড়লে সকলকে গ্রেপ্তার করা হবে।" এই হুমকী বিক্ষোভের আগুনে ঘি ফেলে দেয়। জনতার বিক্ষোভ চরমে ওঠে। পুলিশ জনতার সংগ্রামী মেজাজ দেখে পিছু হঠে। ২ ঘন্টা পর তদন্তকারী অফিসার মহিলা পুলিশ এনে শ্বশুর-শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করে।

পরদিন গ্রামবাসীরা অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করেন। ৭ই জুন ২২৫ জন মহিলা সমেত ২৫০ জন গ্রামবাসী থানায় ডেপুটেশন দেয়। জনতার প্রবল চাপে পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীদের (যারা মিঠাইমণির উপর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন) ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। ১১ই জুন দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁদের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ হয়।

ন্যায়বিচারে কালক্ষেপণ দেখে হুলকাসহ সংলগ্ন ৩টি গ্রামের গ্রামবাসীরা (অধিকাংশই মহিলা) ২১শে জুন এক বিক্ষোভ মিছিল করে থানা ঘেরাও করে পুনরায় দাবি দাওয়া পেশ করেন। এই উদীপ্ত মিছিলে তিন শতাধিক মানুষ জড়ো হন। স্মরণে রাখা যেতে পারে যে এই অঞ্চলের ৬টি গ্রামে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে গত সেপ্টেম্বর ২০২৪-এ অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে এক ঐতিহাসিক মিছিল হয়েছিল। মিঠাইমণির ন্যায়বিচারের দাবিতে বর্তমান চলমান গণআন্দোলন শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনার একমাত্র উপায় তা আবারও প্রমাণ করল।■

● *৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ*

বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ'র প্রকাশ্য অধিবেশন

ভাস্কর ঘোষ ঃ যৌথ কাজের প্রশ্নে সহমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে বিজ্ঞানের জন্য যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই বিজ্ঞানের কথা বলার জন্য মারা হয়েছে। এই আঘাত বিজ্ঞান চিন্তার উপর আঘাত। যারা আঘাত করছে তারা সংগঠিত।

বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা যারা বক্তব্য রেখেছেন তারা ছাড়াও সেই সংগঠনের অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সময় সীমিত থাকায় ইচ্ছে থাকলেও তাদের বক্তব্য আমরা শুনতে পারিনি। পরবর্তী কোনো অনুষ্ঠানে আমরা তাদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে ঐকান্তিক প্রয়াস রাখব। সেইসব সংগঠনের কর্ণধার/সদস্য উপস্থিত ছিলেন তাও উল্লেখ করছি। গোপাল মণ্ডল (কর্ণধার – গ্যালিলিও এস্ট্রোনোমিক্যাল অবসার্ভেটরি)। পরেশ চন্দ্র রায় (বিজ্ঞান দরবার)। ধ্রুবজ্যোতি দে (সম্পাদক, বিজ্ঞান দিশারী, চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব)। তরুণ রায় (গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ), নাস্তিক মঞ্চের সদস্যরা এবং বিজ্ঞান অন্বেষক এর দুইজন সদস্য। তারা তাদের পত্রিকা ও বইয়ের স্টল দেন। উৎসাহীরা পত্রিকা পড়ে দেখেন ও অনেকে সংগ্রহ করেন।

বিজ্ঞান মনস্ক এর মুখপত্র সমীক্ষণ ও Insight এর স্টল দেওয়া হয়। উৎসাহীরা পত্রিকা পড়ে দেখেন ও অনেকে সংগ্রহ করেন। বিজ্ঞান মনস্ক'র একজন সদস্যের লেখা বই ও সম্পাদিত পত্রিকা স্টলে রাখা হয়। অনেকেই তা সংগ্রহ করেন।

এই অধিবেশনে অন্যতম আকর্ষণ ছিল রত্নপাথর নিয়ে 'গ্রহের ফেরে নয়, বিজ্ঞানের আলোয়' শীর্ষক লাইভ শো। এই অনুষ্ঠানে রত্নপাথরের নমুনা নিয়ে সেই পাথর সমূহের ভৌত-রসায়ন এবং এর সঙ্গে যে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক নেই তার একটি মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র এক অপবিজ্ঞান, 'যে যত বড় জ্যোতিষী সে তত বেশি ভণ্ড' এই বক্তব্য সামনে রেখে জ্যোতিষের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। সেইসাথে রাষ্ট্র যে জ্যোতিষশাস্ত্র টিকিয়ে রাখতে মদত দিচ্ছে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়। একই সঙ্গে এবিষয়ে রাষ্ট্রের ভূমিকা তুলে ধরে দাবি জানানো হয় যে এসব পাথরের গুণগত মান যাচাইয়ের যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাতে এটা লেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে যে 'এই পাথর ধারণ করার সঙ্গে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কোনও সম্পর্ক নেই'।

অধিবেশনে খালি গলায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শুভ্রজ্যোতি ও দুলাল চ্যাটার্জী। একটি অসাধারণ আবৃত্তি পরিবেশন করে ছোট্ট মেয়ে উস্রি নায়েক। শেষের দিকে আর একটি আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিজ্ঞান মনস্ক'র সদস্য মৌমিতা মাইতি।

এই সাংস্কৃতিক পর্ব উপস্থিত শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

এবছর ISC-তে ৪০০ তে ৪০০ পেয়ে প্রথম স্থানাধিকারী 'সৃজনী' এর ইন্টারভিউর ভিডিও দেখানো হয়। সৃজনী নিজের পদবী রাখে নি। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে জাতপাতের বিরুদ্ধে তার এই লড়াইকে বিজ্ঞান মনস্ক সাধুবাদ জানায়।

একেবারে শেষে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ এর সভাপতি এই সম্মেলনের আলোচনার সারবত্তা তুলে ধরেন। সবাইকে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। পরিশেষে সবাইকে ধন্যবাদ ও সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ■

বিশেষ রচনা ঃ

অন্তর্জালের অন্ধকারময় স্থান – ডার্ক ওয়েব

– লোহিতার্ক সান্যাল

ইন্টারনেটের আবিষ্কার মানুষের জ্ঞানের জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়েছে। বিজ্ঞানের দৌলতে ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান সুবিশাল তথ্যভান্ডারকে খুব সহজেই হাতের নাগালে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সাথে যন্ত্রের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে যুক্ত করে তথ্য সংগ্রহকে অবিশ্বাস্য গতিময় ও নির্ভুল করে চলেছে। নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথেই যন্ত্র সেই তথ্যভান্ডারকে হাজির করছে আমাদের চোখের সামনে। মানুষের মস্তিষ্কের গড় প্রতিক্রিয়া সময়কে আধুনিক যন্ত্র বহু পিছনে ফেলে দিয়েছে ও ব্যবধান বাড়িয়েই চলেছে। এ যেন এক আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। মনের ইচ্ছা প্রকাশ করার সাথে সাথে আমাদের নিক্ষেপ করে এক অন্তহীন জ্ঞানসমুদ্রে। এতদসত্ত্বেও ভাবতে অবাক লাগে সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা নেট জগতের মোট তথ্য ভান্ডারের অতি সামান্য অংশের কাছেই পৌঁছতে সক্ষম। ইন্টারনেটের সুবিশাল অংশ তাদের কাছে থাকে অধরা।

ইন্টারনেটের তথ্যভান্ডারকে যদি একটি মহাসাগরের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে মহাসমুদ্রের যে অংশে একজন নাবিক বিচরণ করে বা একজন সাঁতারু ডুব সাঁতার দিয়ে সর্বোচ্চ যে গভীরতায় পৌঁছতে সক্ষম তাকে বলা হয় সারফেস ওয়েব বা পৃষ্ঠতল অন্তর্জাল। ঐ অঞ্চলকে বাদ দিয়ে মহাসমুদ্রের যে বিশাল অংশ অবশিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় ডীপ ওয়েব বা গভীর অন্তর্জাল। আবার ডীপ ওয়েবের গভীরতম অংশকে বলা হয় ডার্ক ওয়েব বা অন্ধকারময় অন্তর্জাল। তাই ডার্ক ওয়েব হল ডীপ ওয়েবের উপসেট। সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বিচরণ ক্ষেত্র হল কেবলমাত্র পৃষ্ঠতল ইন্টারনেট। গুগল, ইয়াহু, বিং-এর মতো সাধারণ সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে এই স্তরের তথ্যভান্ডারের নাগাল সহজেই পাওয়া যায়। তাই একে দৃশ্যমান ইন্টারনেটও বলা হয়। কম্প্যুটার ও মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত সাধারণ সফটওয়ার ও সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে এখানে প্রবেশ করা যায় এবং এই স্তর পাস-ওয়ার্ড দ্বারা সুরক্ষিত নয় তাই ব্যবহারকারীর পরিচয় গোপন থাকে না। এই অঞ্চলে রয়েছে নিউজ ওয়েবসাইট, ই-কমার্স, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম, অনলাইন শিক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়, বিভিন্ন ধরনের ব্লগ ইত্যাদি। ফেসবুক, অ্যামাজন, উইকিপিডিয়া, ইউটিউবসহ দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রায় সব সাইটের অবস্থান এই অঞ্চলে। এই স্তরের আয়তন সমগ্র ইন্টারনেটের আয়তনের মাত্র ৪-৫ শতাংশ। এর অর্থ হল ইন্টারনেটের অবশিষ্ট সুবিশাল অঞ্চল সাধারণ ব্যবহারকারীদের কাছে অজানা যা ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না।

পৃষ্ঠতল ইন্টারনেট স্তরের পরবর্তী স্তর হল ডীপ ওয়েব এই স্তরে রয়েছে ব্যক্তিগত তথ্যাদি, ই-মেল ইনবক্স, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এর গোপন তথ্যাবলী, পাস-ওয়ার্ড সুরক্ষিত অ্যাকাউন্ট-এর তথ্যসামগ্রী, পাস-ওয়ার্ড সুরক্ষিত অ্যাপ ইত্যাদি। পাস-ওয়ার্ড সুরক্ষিত হবার কারণে এর নিরাপত্তা বেশি, তবে ১০০% সুরক্ষিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এ লেনদেন বা অন-লাইন কেনাবেচার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রাহকের তথ্য গোপন থাকে না। কারণ, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কাছে গ্রাহকের তথ্য গোপন থাকলে পরিষেবা ব্যহত হবে। ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের কাছে তথ্যগোপনের দায়বদ্ধতা থাকলেও, গ্রাহকের তথ্য চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে অহরহ। টাকা পয়সা বা তথ্যের অনলাইন আদান-প্রদানের সময় গ্রাহকের তথ্য চুরি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাছাড়া দক্ষ হ্যাকাররা সরাসরি সার্ভার হ্যাক করেও তথ্য চুরি করে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহকই অর্থহানি ও দুর্ভোগের শিকার হন। সুরক্ষা বলয় ক্রমশঃ শক্তিশালী হলেও তার সাথে পাল্লা দিয়ে হ্যাকিং পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটছে। বর্তমানে তথ্য সুরক্ষা মজবুত করতে 'এন্ড-টু-এন্ড ইনক্রিপটেড' শব্দবন্ধটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে খুবই পরিচিত। এর অর্থ হল তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে প্রেরক ও প্রাপক ব্যতীত কোন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে সমস্ত তথ্য থাকবে গোপন। তবে, প্রেরক ও প্রাপকের মাঝে যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা হ্যাকারের অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে তথ্য সুরক্ষিত না থাকার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

ডীপ ওয়েবের আরও গভীরে রয়েছে ডার্ক ওয়েব বা ডার্ক নেট। ইন্টারনেটের এই স্তরে ব্যবহারকারীদের পরিচয় ও অবস্থান থাকে সম্পূর্ণ গোপন। 'টর'-এর মতো বিশেষ ব্রাউজার ব্যতীত কোনো সাধারণ ওয়েব ব্রাউজারের সাহায্যে সেখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। ডার্ক নেটে প্রবেশ করতে গেলে সেল ফোন বা কম্প্যুটারে প্রয়োজন হয় বিশেষ সফটওয়ারের। ডার্ক ওয়েবের যে সমস্ত সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে অন্যতম

হল, ডাকডাকগো, ফ্রীনেট, টর্চ, ক্যান্ডেল ইত্যাদি। সাধারণ ব্রাউজারের শেষে 'ডট কম', 'ডট নেট' বা 'ডট ওআরজি'-র মতো ডোমেন ব্যবহার হয়ে থাকে। অন্যদিকে, ডার্ক ওয়েবের ব্রাউজারে 'ডট অনিয়ন', 'ডট বিটনেট' ইত্যাদি ডোমেন ব্যবহার হয়ে থাকে। ডার্ক ওয়েবে প্রবেশে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই বা প্রবেশ বেআইনি নয়। ডার্ক ওয়েবের কোন সাইটে পৌঁছাতে গেলে ব্যবহারকারীকে ওই সাইটের সঠিক ঠিকানা জানা থাকলেই হবে না, থাকতে হবে কম্প্যুটারের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান যেমন, প্রোগ্রামিং, নেটওয়ার্কিং, প্রক্সি, হ্যাকিং ইত্যাদি। এখানকার সাইটগুলির সুরক্ষা বলয় এতটাই শক্তিশালী যে সাধারণ হ্যাকার তা অতিক্রম করতে পারে না। এই কারণেই পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রশাসন ও বিভিন্ন এজেন্সী তাদের অত্যন্ত গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করে থাকে। প্রশাসনিক, সামরিক, দেশের সুরক্ষা বিষয়ক, যুদ্ধ, গোয়েন্দা, ব্যবসা, হ্যাকিং ইত্যাদি বিষয়ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য ইন্টারনেটের এই স্তর ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য ডার্ক নেট সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্যই হল এখানকার কার্যকলাপকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা। ডার্গ ওয়েবের যাত্রা শুরু হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক ছাত্র ইয়ান ক্লার্ক তার গবেষণা পত্রের বিষয় ছিল নাম গোপন রেখে অনলাইনে কিভাবে ফাইল পাঠানো যায়। এই ধারণাটিকেই 'টর' প্রোজেক্টের ভিত্তি হিসাবে মনে করা হয় যা ২০০২ খ্রিস্টাব্দে সামনে আসে। এরপর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম চালু হয় 'টর' ব্রাউজার। জানা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ সর্বপ্রথম তাদের তথ্য সুরক্ষার জন্য ডার্ক নেট ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশের প্রশাসন ও বিভিন্ন এজেন্সী এই পথ গ্রহণ করে। গবেষণার মাধ্যমে সুরক্ষা বলয় ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে।

এই লৌহদৃঢ় গোপনীয়তার সুযোগ নিয়ে ডার্কনেটের ভিতরে ঘটে চলেছে বিভিন্ন নিকৃষ্টতম কার্যকলাপ যা দৃশ্যমান নেটের সাধারণ ব্যবহারকারী বা সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে কল্পনার অতীত। বেআইনী অস্ত্র কেনাবেচা, নিষিদ্ধ ড্রাগ কেনাবেচা, শিশু পর্ণোগ্রাফি, নারী পাচার, চুরি করা তথ্য কেনাবেচা ইত্যাদি ডার্ক নেটের রোজকার বিষয়। একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে ডীপ নেটের প্রায় ৬০% এই রকম অপরাধমূলক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। ডার্ক নেটের তথ্যের আয়তন দৃশ্যমান নেটের প্রায় ৫০০০ গুণ। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ডার্ক ওয়েবের সাইটের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার যা আগের বছরের তুলনায় ৪৪% বেশি। ঐ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী প্রতিদিন প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ ডার্ক নেট ব্যবহার করেছিল। বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত গতিতে। ডার্ক নেটে সক্রিয় ড্রাগ বাজার রয়েছে প্রায় ১ হাজার যাতে তালিকাভুক্ত রয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার ড্রাগ। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ১৫০০ কোটি চুরি যাওয়া ব্যক্তিগত তথ্য সনাক্ত করা গেছিল। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন একাউন্টের লগ-ইন পাসওয়ার্ড, ব্যাঙ্ক একাউন্টের গোপনীয় তথ্য ইত্যাদি। ডার্ক নেটে এই চোরাই তথ্যের (ক্রেডিট কার্ড সহ) কেনাবেচা চলে অবিশ্বাস্য রকম উচ্চমূল্যে। প্রায় ৮০% ই-মেল-এর তথ্য ডার্ক ওয়েবে রয়েছে উন্মুক্ত বা প্রকাশ্য অবস্থায় অর্থাৎ তার কোন গোপনীয়তা নেই। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, ডার্ক নেটের অস্ত্র বাজারে তালিকাভুক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা ৩৫ হাজারের বেশি। এরমধ্যে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র। মোট বাজারের ৫৮% অস্ত্রের কারবার আমেরিকার দখলে, ১১% ইউরোপের ও ৭% রয়েছে রাশিয়ার দখলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার'র হিসাব অনুযায়ী ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বে মানব পাচারের শিকার আড়াই কোটির বেশি মানুষ। এর মধ্যে প্রায় ৭৯% যৌন নির্যাতন ও প্রায় ১৮% শিশু শ্রম ও বলপূর্বক শ্রমদানের সাথে সম্পর্কিত। গুপ্তহত্যা, গণহত্যা, জাতিদাঙ্গা, সন্ত্রাস ইত্যাদি সংগঠিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন এজেন্সীর মধ্যে গোপন মিটিং, দর কষাকষির নিরাপদ জায়গা হল এই ডার্ক ওয়েব।

ডার্ক ওয়েব জুড়ে মোট ব্যবসার পরিমাণটাও নেহাত কম নয়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ডার্ক নেটে কেনা বেচা হয়েছে ৫২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতি বছর ২১.৮% বৃদ্ধি হারে ২০৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এর পরিমাণ হবে আনুমানিক ২৯২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সমস্ত কেনাবেচার মাধ্যম হল ক্রিপ্টোকারেন্সি বা গুপ্তমুদ্রা। এর মধ্যে ৯৮% হল বিটকয়েন-এর মতো ডিজিটাল মুদ্রা। ক্রিপ্টোকারেন্সি হল একটি বিকেন্দ্রীকৃত অর্থপ্রদান পদ্ধতি যা কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কাজ করে। ডিজিটাল মুদ্রায় লেনদেনের জন্য মুদ্রার প্রাপক ও প্রেরকের ব্যক্তিগত তথ্য জানার প্রয়োজন পড়ে না, লেনদেন প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ ও দ্রুত। বিটকয়েনের লেনদেনগুলি 'ব্লক চেইন' নামে একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে রেকর্ড করা হয়, যা একটি পাবলিক লেজার, যা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে। আন্তর্জাতিক টেন্ডার ও অন্যান্য লেনদেনের জন্য এটি একটি অন্যতম প্রধান বিকল্প। পুঁজিবাদী অর্থনীতির

●*শেষাংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

শব্দের খেলা

– সৌমিলী মিত্র রায়

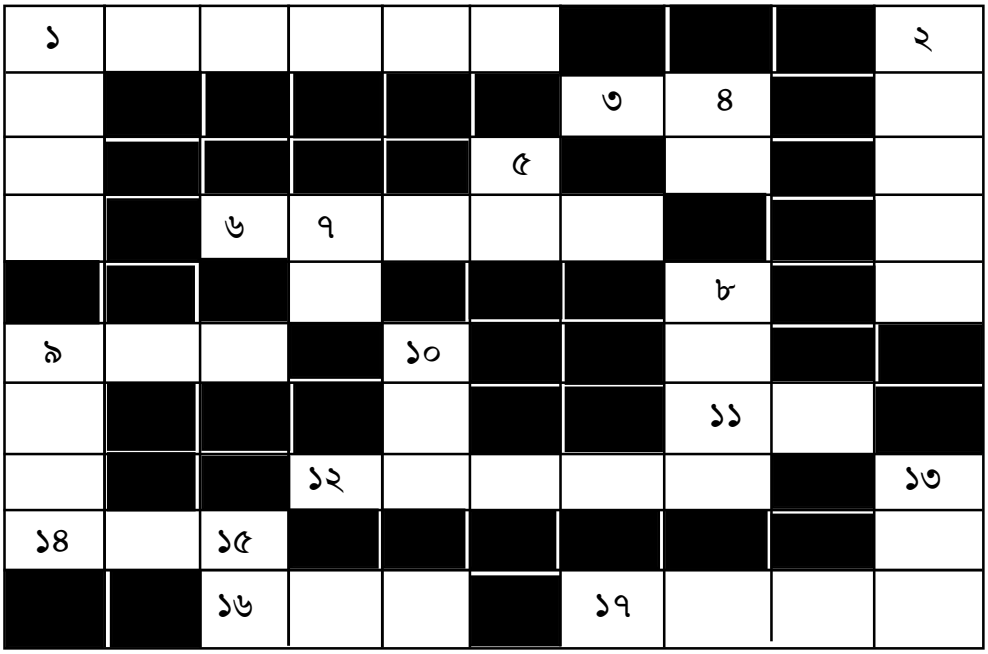

পাশাপাশি

১. আপেক্ষিকতাবাদের জনক (৬)

৩. জীবনদেহের একক (২)

৬. গণিতশাস্ত্রের শাখা (৫)

৯. লিটমাস পেপার লাল করে (৩)

১১. ধান বা অন্য শস্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত একক (২)

১২. ম্যানগ্রোভ বা বাদাবন মেলে যেখানে (৫)

১৪. রক্তরঙা এ ফুল সাহিত্যে সমাদৃত,
বৈজ্ঞানিক গবেষণাও তাকে নিয়ে (৩)

১৬. বংশবিস্তারের পদ্ধতি (৩)

১৭. কৃত্রিম মিষ্টকারক (৪)

উপরনিচ

১. মুখশুদ্ধি হিসাবে ব্যবহৃত হয় (৪)

২. জলে জন্মানো উদ্ভিদ, আগাছা (৫)

৪. তন্তু বিশেষ (২)

৫. কোশগুচ্ছ থেকে সৃষ্ট, টিস্যু বলে খ্যাত (২)

৭. ভগ্নাংশ উর্ধাংশ (২)

৮. মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের নির্ণায়ক (৪)

৯. ভিনিগারে যে অ্যাসিড থাকে (৪)

১০. ঔষধি গাছ, শেষ দু'য়ে কন্দ (৩)

১৩. নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী যখন পদার্থবিদ্যায় _____ এফেক্ট-র জন্য বিখ্যাত

১৫. যা থেকে চারা হয় (২)

(সমাধান আগামী সংখ্যায়)

পরিবেশবাদ বনাম পরিবেশ বিজ্ঞান ঃ

পৃথিবী জুড়ে কি সমুদ্রের জলতল উপরে উঠে আসছে?

দীর্ঘকাল ধরে একটা প্রচার লাগাতার শুনতে শুনতে আমরা একটা স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছি যে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার, শিল্প উৎপাদন, কৃষিতে অজৈব সারের ব্যবহার ইত্যাদি মনুষ্যজনিত ক্রিয়াকলাপের ফলে পৃথিবী ক্রমান্বয়ে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর হয়ে উঠছে। মনুষ্যজনিত বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে (মহাদেশ ও সাগরে) সঞ্চিত বরফের আচ্ছাদন (গ্লেসিয়ার) গলে যাচ্ছে এবং এর ফলে বিপুল জলরাশি সাগরগুলিতে জমা হয়ে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতাবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। মানুষ যদি বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ না করে তবে অতি দ্রুত বিশ্বের সকল উপকূলবর্তী শহর ও গ্রামগুলি সমুদ্রের জলের তলায় চলে যাবে এবং এতে বহু প্রজাতি (উদ্ভিদ ও প্রাণী)র গণবিলুপ্তি ঘটবে। সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে এই লাগাতার প্রপাগান্ডার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্বরূপ উন্মোচন তাই জরুরি হয়ে পড়েছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা এই প্রচারের সত্যতা কিছু পরিমাণ আলোচনা করলেও সমুদ্রতলের ওঠা-পড়া, যাকে ভূবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় marine transgression and marine regression তা আলোচনা করা জরুরি। আমাদের এই আলোচনাও জরুরি যে এই সমুদ্রতলের ওঠা-পড়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কী? আমাদের এই প্রশ্নটাও আলোচনা প্রয়োজন যে কোন একটি নির্দিষ্ট সময়কালে (জিওলজিক্যাল টাইম) বিশ্বের সকল সমুদ্র উপকূলেই কি এই সমুদ্রতলের বৃদ্ধি (অথবা হ্রাস) একসঙ্গে হয়? আমাদের তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে এটাও বিচার করতে হবে যে এই সমুদ্রের জলতলবৃদ্ধি (এবং অবশ্যই জলতল হ্রাস) বিশ্বের কোন্ প্রান্তে এই মুহূর্তে ঘটছে এবং পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে এরকম ঘঠনা কি নতুন না বারে বারে চক্রাকারে ঘটে চলেছে?

সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থান (marine transgression) এবং পতন (marine regression) কী?

সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান (marine transgression) হল একপ্রকার বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া যেখানে কোন সমুদ্র উপকূলের জলতলবৃদ্ধি পায় এবং উপকূলরেখা (Shore Line) সময়ের সাথে সাথে মহাদেশের দিকে এগিয়ে যায়। বিপরীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের পতন (marine regression) হল একপ্রকার বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া যেখানে সমুদ্রের জলতল নেমে যায় এবং উপকূলরেখা সময়ের সাথে সাথে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যায়, একসময় সমুদ্রের জলতলের নিচে থাকা ভূপৃষ্ঠ উন্মুক্ত হয়। (চিত্র-১ এবং ২) পৃথিবীতের উপকূলের যে অংশে সমুদ্রের উত্থান হয় সেই অংশে মহাদেশের ক্ষেত্রফল কমে যায় এবং উপকূলের যে অংশে সমুদ্রের পতন হয় সেই অংশে মহাদেশের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের উপকূলে উদিপি অঞ্চলে প্রায় ৯৫ কিমি লম্বা বরাবর ৪২.১৯ বর্গ কিমি অঞ্চল সমুদ্রের ১ মিটার নিচে এবং ৩৭২.০৮ বর্গ কিমি অঞ্চল সমুদ্রের ১০ মিটার নিচে চলে যাচ্ছে। (তথ্যসূত্র ঃ কোস্টাল ভালনারেবিলিটি অ্যাসেসমেন্ট – রিসার্চ গেট স্টাডি)। অন্যদিকে গত তিন দশকে উপগ্রহ চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে কোথাও ১০০০ বর্গ কিমি জমি বেড়ে গেছে এবং গড়ে ৫৯০ বর্গ কিমি জমি বেড়েছে ১৯৮৯ থেকে ২০১৮ অবধি। পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর বয়ে আনা পলি ঐ জমি তৈরি করেছে। (তথ্যসূত্র ঃ Bangladesh's Dynamic Coastal regions - science direct.com)

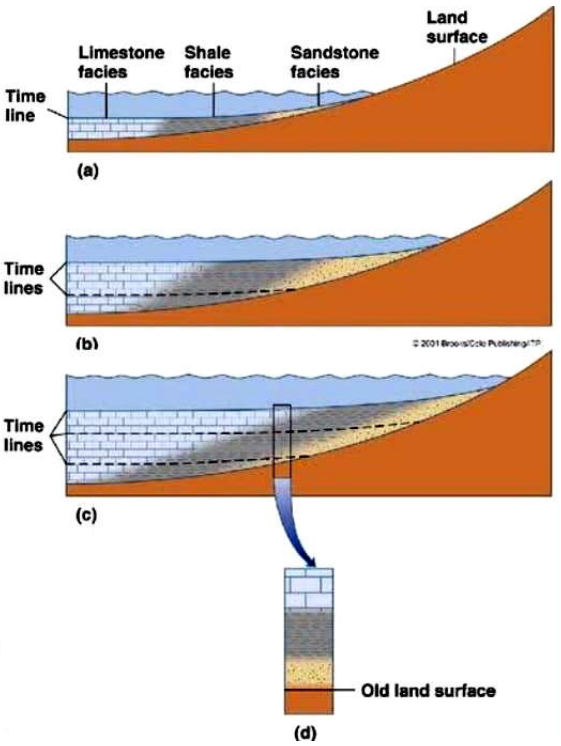

(চিত্র - ১) সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থান (marine transgression)

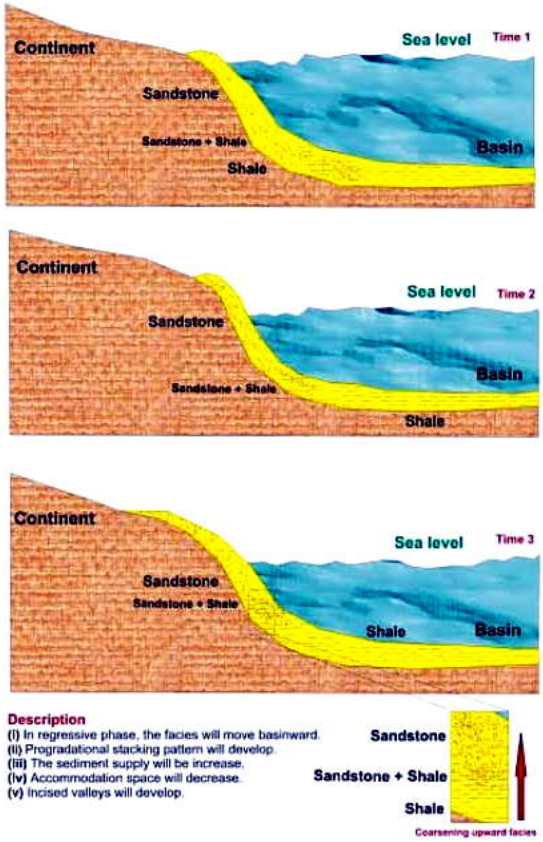

(চিত্র - ২) সমুদ্রপৃষ্ঠের পতন (marine regression)

সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান বা মেরিন ট্রান্সগ্রেশন এবং পতন বা মেরিন রিগ্রেশন কেন হয়? এর বহু কারণ আছে। প্রধান কারণগুলি নিম্নপ্রকার –

১) সমুদ্রের (একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে) জলের আয়তনের পরিবর্তন ঃ

ক) হিমবাহের গলন – বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে মহাদেশের এবং সমুদ্রে ভাসমান হিমবাহের দ্রুতহারে গলন সমুদ্র জলের আয়তন বাড়িয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ঘটাতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীর উত্তর মহাসাগর (আর্টিক সাগর) এবং আন্টার্কটিকা মহাদেশের উপকূলে এই ঘটনা দেখা যাচ্ছে। এখানে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থান ঘটছে। আবার কোনো মহাদেশে নতুন হিমবাহের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি সমুদ্রপৃষ্ঠের পতন ঘটায় এটা ঘটে বরফ বা বিশ্ব শীতলায়ন যুগে।

খ) সমুদ্র জলের তাপীয় প্রসারণ (thermal expansion) – সমুদ্রের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য জলের আয়তন বৃদ্ধি সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ঘটায় আবার গড় উষ্ণতা হ্রাস জলের আয়তন হ্রাস ঘটিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের পতন ঘটায়। এই প্রক্রিয়া প্রতিবছর সময়ান্তরে চলতেই থাকে।

গ) সমুদ্র অববাহিকার জল ধারণ ক্ষমতার (Ocean basin capacity)র পরিবর্তন – আমাদের মনে রাখতে হবে যে গোটা পৃথিবীর সমুদ্র কোন একটা অখন্ড বস্তু নয়। এমনকি কোন একটি সমুদ্রও অখন্ড নয়। সমুদ্রের তলদেশ অসংখ্য ফাটল এবং চ্যুতিতল (fault plane) দ্বারা বিভক্ত। আবার উপকূলীয় মহাদেশের আকার ও আয়তনেরও নিরন্তর ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে চলে নানা ক্ষয়কার্য, ভূমিধ্বস, অগ্নুৎপাত, পলি সঞ্চয়ের হারের পরিবর্তন ইত্যাদি নানা কারণে। এই কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র অববাহিকা (ocean basin) এর আয়তন পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের একই পরিমাণ জলের উত্থান যেমন ঘটে পতনও তেমনি ঘটে। ওসেন বেসিনের আয়তন অপেক্ষাকৃত কমলে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন হয় আবার ওসেন বেসিনের আয়তন অপেক্ষাকৃত বাড়লে মেরিন রিগ্রেশন হয়।

২) ভূআলোড়ন বা টেকটনিক মুভমেন্ট ঃ আগেই বলা হয়েছে যে সমুদ্র কোন অখন্ড বস্তু নয় আবার তা স্থির বা নিশ্চল বস্তুও নয়। পৃথিবীর সাগর এবং মহাদেশে চলেছে নিরন্তর ভূ-আলোড়ন। একমাত্র বড় ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাতের মত ঘটনা ঘটলে আমরা তা টের পাই। সমুদ্রতলের মধ্যস্থ চ্যুতিতল বরাবর বিভিন্ন ওসেন বেসিনের নিরন্তর পাশাপাশি এবং উপর-নিচে সরণ ঘটছে। এতে এক একটি ওসেন বেসিনের আয়তনের পরিবর্তন ঘটছে। একইভাবে মহাদেশের ভূ-অভ্যন্তরেও ঘটে চলেছে নিরন্তর ভূ-আলোড়ন। চলছে পবর্তমালা সৃষ্টির প্রক্রিয়া (Orogenesis), ভূমির উত্থান-পতন (Epirogenesis)। সমুদ্রের অভ্যন্তরে কোথাও সাগর প্রসারিত হচ্ছে (যেমন আটলান্টি সাগরের মাঝ বরাবর) আবার কোথাও নতুন সাগরের জন্ম হচ্ছে (যেমন পূর্ব আফ্রিকা), আবার কোথাও পুরানো সাগরের ধ্বংসপ্রক্রিয়া চলছে (যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে)। এইসকল ভূ-আলোড়নের ফলে যে অঞ্চলে সাগর উপকূলীয় মহাদেশের তুলনায় নেমে যাচ্ছে সেখানে সমুদ্রপৃষ্ঠের পতন হচ্ছে আবার যেখানে সাগর উপকূলীয় মহাদেশের তুলনায় উঠে যাচ্ছে সেখানে সাগরের অতিরিক্ত জল মহাদেশের একাংশকে প্লাবিত করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ঘটাচ্ছে।

৩) ভূত্বকীয় ভারসাম্য (Isostatic Adjustment) ঃ মহাদেশীয় ভূপৃষ্ঠের উপরকার হিমবাহ বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে গলে গেলে ভূত্বকের উপর থাকা ভারি হিমবাহের জন্য যে ওজন ভূত্বকের উপর এতদিন ছিল তা না থাকার কারণে ভূত্বকীয়

ভারসাম্য বজায় রাখতে মহাদেশের আপেক্ষিক উত্থান ঘটে। যদিও এই প্রক্রিয়া হিমবাহের গলন জনিত সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থানের তুলনায় অনেক ধীর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় মহাদেশের উত্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠের সামান্য পতন হয়।

৪) পলি সঞ্চয়ের হার (Rate of Sedimentation) ঃ উপকূলীয় মহাদেশে ভূমির ক্ষয়, পলির পরিবহন এবং পলি সঞ্চয়ের হার যদি সমুদ্রতলের আপেক্ষিক অবনমনের হারের তুলনায় বেশি হয় তবে সমুদ্রে পলি সঞ্চয়ের জন্য যে মোট স্থান তা অপেক্ষা পলির পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। ফলে অতিরিক্ত পলি সঞ্চয় সমুদ্রপৃষ্ঠের পতন ঘটিয়ে উপকূলরেখার সমুদ্রের দিকে সরণ বা মেরিন রিগ্রেশন ঘটায়। আবার পলি সঞ্চয়ের হার যদি সমুদ্রতলের আপেক্ষিক অবনমনের হারের তুলনায় কম হয় তবে সমুদ্রে পলি সঞ্চয়ের স্থান পলি দ্বারা ভরাট হয় না। ফলে সমুদ্রতলের উত্থান ঘটে উপকূলরেখা মহাদেশের দিকে এগিয়ে নিয়ে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন ঘটায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে যখন মহাদেশ ও সমুদ্রের তলের কোন অবনমন (subsidence) ঘটে না তখন মহাদেশ থেকে সমুদ্রে আসা পলির সঞ্চয়ের হার সমুদ্রে বেশি হলে মেরিন রিগ্রেশন হয়।

৫) সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতনের ক্ষেত্রে মহাজাগতিক শক্তির ভূমিকাও আছে। বিশেষতঃ সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব, কৌণিক অবস্থান, অক্ষতলের অবস্থানের পরিবর্তন। এগুলিও ঘটে চক্রাকারে এবং দীর্ঘ সময়ান্তরে। এই চক্রকে মিলাঙ্কোভিচ চক্র বলা হয়। এর প্রভাবেই মুখ্যত পৃথিবীর জলবায়ু প্রোটরোজোয়িক সময়কাল (আজ থেকে ২৫০ কোটি বছর আগে) থেকে পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর প্রভাবে হিমবাহ সৃষ্টি ও তার গলন ঘটে যথাক্রমে মেরিন রিগ্রেশন ও ট্রান্সগ্রেশন ঘটে থাকে। সূর্য ছাড়া সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সমুদ্রতলের উত্থান ও পতন নিয়ে গবেষণা চলছে। স্থির সিদ্ধান্ত কিছু জানা যায় নি। সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের ভূমিকাই প্রধান হলেও এখনও মেরিন ট্রান্সগ্রেশন/রিগ্রেশনে চাঁদের ভূমিকা প্রমাণিত হয় নি।

যে কারণগুলির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন হয় তার একটি বা একাধিক কারণ একসঙ্গে ক্রিয়াশীল হতে পারে একই অঞ্চলে। সকল কারণগুলির নিট ফলাফল হিসাবে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান বা পতন দেখা যায়। অনেকগুলি কারণ একই সঙ্গে কার্যকরী থাকলে এর প্রাবল্যের হারের পার্থক্যের উপর সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন অঞ্চল ভেদে পৃথক হয়, এমনকি খুব কাছাকাছি অঞ্চলের মধ্যেও একস্থানে উত্থান এবং একস্থানে পতন দেখা যায়। যেমন সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলে এখন চলছে মেরিন রিগ্রেশন অথচ মৌসুমি দ্বীপ এবং বকখালিতে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন। বঙ্গোপসাগরের উত্থানের ফলে গঙ্গা সহ অন্য নদীগুলি স্ফীত হয়ে কলকাতা শহর আগামী ১৫-২৫ বছরের মধ্যে সমুদ্রতলে চলে যাবার যে ভারি প্রচার সাম্প্রতিককালে পরিবেশবাদীরা করছেন তার বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি এই প্রচারকরা এখনও রাখেন নি। শুধু একটা কথাই বলা যায় যে বঙ্গোপসাগরে নানা অঞ্চলে সমুদ্রতলের উত্থান ও পতনের যা হিসাব পাওয়া গেছে, নিট ফলাফল পতনকেই ইঙ্গিত করে উত্থান নয়। সুন্দরবনে একের পর এক দ্বীপের জেগে ওঠা তাই প্রমাণ করে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান এবং পতন নিছক বর্তমান যুগের ঘটনা নয়

রাষ্ট্রসংঘ, তার উপাঙ্গ সংগঠন আই সি সি সি, বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতা, সরকার, এন জি ও তথা নানা পরিবেশবাদী সংগঠন লাগাতার প্রচার করে চলেছে যে মনুষ্যজনিত উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে হিমবাহগুলির গলন ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে আর কিছুদিনের মধ্যেই সকল উপকূলগুলি প্লাবিত হতে চলেছে। এর জন্য দায়ী থাকবে জনসাধারণ। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের পর বিশ্বব্যাপী শিল্পায়ন, নগরায়ন, জ্বালানি ও সারের উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি এর কারণ। এইসব উপদেশ এবং সাবধানবাণী যখন শোনান হয় তখন কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান (এবং পতন) এর বৈজ্ঞানিক কারণ তৃতীয় শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর অবধি অবশ্য পাঠ্য পরিবেশবিদ্যা পাঠক্রমে সেখানো হয় না। এগুলি যে প্রাকৃতিক কারণে কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলে চক্রাকারে ঘটে চলেছে সেই কথাও শেখানো হয় না।

পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে পৃথিবীর প্রতিটি সমুদ্র উপকূলে কোটি কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক কারণে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন এবং মেরিন রিগ্রেশন চক্রাকারে ঘটে চলেছে নিরন্তর। সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান (এবং পতন) শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবতনের জন্য ঘটে না। বিভিন্ন ভৌগোলিক এবং ভূতাত্ত্বিক কারণে ঘটে এসেছে, ঘটছে এবং আগামী দিনেও ঘটবে। এই পৃথিবীতে মানুষ আসবার কোটি কোটি বছর আগেও ঘটত আজও ঘটছে। পৃথিবীর পরিবেশ কখনও কোনদিন একরকম ছিল না, থাকবেও না। পৃথিবীর পরিবেশ স্থির নয়, গতিশীল। এক গতিশীল সাম্যাবস্থার মধ্য দিয়ে তার বিবর্তন ঘটে চলেছে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন এর প্রমাণ কী? ভূবিজ্ঞানীরা বিশেষতঃ সেডিমেন্টেলজিস্ট (পাললিক শিলা বিশেষজ্ঞ)রা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন সেডিমেন্টারি বেসিন অ্যানালাইসিস করে

পৃথিবীর প্রাচীন উপকূলীয় অঞ্চলের (যা বর্তমানে মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাললিক শিলাস্তর হিসাবে রয়েছে) পাললিক শিলার উপাদান, গঠন ইত্যাদি গবেষণা করে প্রাচীন পৃথিবীর বুকে ঘটা সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতনের চক্রকে আবিস্কার করেছেন। বিন্ধ্যপর্বত, আরাবল্লী পর্বত, হিমালয় পর্বত, কচ্ছ-কাথিয়াবার উপকূলের প্রাচীন শিলাস্তর প্রমাণ করে ঐসব অঞ্চলের প্রাচীন সমুদ্র উপকূলে চক্রাকারে বারে বারে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন এবং রিগ্রেশন ঘটেছে। এই শিলাস্তরে যদি নিচ থেকে উপরে পলির দানার মাপ (Grain size) ক্রমশ বাড়তে থাকে তবে ঐ শিলাস্তর মেরিন রিগ্রেশনকে চিহ্নিত করে। শিলাস্তরে যদি নিচ থেকে উপরে পলির দানার মাপ (Grain size) ক্রমশ কমতে থাকে তবে ঐ শিলাস্তর মেরিন ট্রান্সগ্রেশনকে চিহ্নিত করে (চিত্র-১,২)।

বর্তমান পৃথিবীর কোথায়
সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন ঘটছে?

বর্তমান পৃথিবীর প্রতিটি সমুদ্র উপকূলেই কোথাও মেরিন ট্রান্সগ্রেশন বা মেরিন রিগ্রেশন ঘটছে।

বর্তমানে মেরিন ট্রান্সগ্রেশনের উদাহরণ –

* উত্তর মহাসাগর বা আর্টিক ওসেনের উপকূল বরাবর অধিকাংশ অঞ্চলে বর্তমানে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন ঘটছে। বিজ্ঞানীদের অভিমত বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য যে হিমবাহের গলন ঘটে সমুদ্রে জলের পরিমাণ বাড়িয়েছে উপরন্তু অঞ্চলের উপকূলের মাটি-পাথর ইত্যাদি দীর্ঘকাল শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে থাকার পর তাপমাত্রা হিমাঙ্কের উপরে ওঠায় ঐ অঞ্চলের মাটি ও পাথরে জমাটবদ্ধ অবস্থা ভাঙছে। এর ফলে সমুদ্রের উপকূলের মাটির ও পাথরের ভাঙন ধরে ভূমিধ্বস শুরু হচ্ছে। এই ভূমিধ্বসের ফলে পাড় ভেঙে ভেঙে সাগর মহাদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বিজ্ঞানীদের মতে এই অঞ্চলের মেরিন ট্রান্সগ্রেশনের বড় কারণ এটি।

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিক এবং গাল্ফ কোস্ট বরাবর মেরিন ট্রান্সগ্রেশন চলছে।

* ভারতের আরবসাগর (পশ্চিম উপকূল) বিশেষতঃ কর্ণাটক রাজ্যের বাইনদুর হোল অঞ্চলে প্লাইটোসিন যুগের রিগ্রেশন পর্ব শেষ করে বিগত ৬৪০০ বছর ধরে সামুদ্রিক পৃষ্ঠতলের উত্থান ঘটে চলেছে।

* ভারতের বঙ্গোপসাগর উপকূল (পূর্ব উপকূলের) কাবেরী অববাহিকা (কাবেরি বেসিন) অঞ্চলে বর্তমানে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন চলছে।

* পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গোপসাগর উপকূলের মৌসুমি দ্বীপ এবং বকখালি অঞ্চলে বর্তমানে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন চলছে।

বর্তমানে মেরিন রিগ্রেশনের উদাহরণ –

* ভারত মহাসাগরের আফ্রিকার সোমালিয়া উপকূলে বর্তমানে মেরিন রিগ্রেশন চলছে।

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল, বিশেষতঃ রাজধানী ওয়াশিংটন কোস্ট বরাবর বর্তমানে মেরিন রিগ্রেশন চলছে।

* ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বর্তমানে ভালো আকারে মেরিন রিগ্রেশন চলছে। সমুদ্র উপকূলে পলিসঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট অসংখ্য বালিয়াড়ি ইত্যাদি তা প্রমাণ করে।

* বঙ্গোপসাগরে ভারতের পূর্ব উপকূলের কৃষ্ণা এবং গোদাবরী নদী অববাহিকা প্রচুর বালির লম্বা দ্বীপ (চেনিয়ার্স) বা সামুদ্রিক অমেরুদন্ডী প্রাণীর খোলকের তৈরি বালিয়াড়ি ইত্যাদির উপস্থিতি প্রমাণ করে এই অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে মেরিন ট্রান্সগ্রেশন হলেও বর্তমানে মেরিন রিগ্রেশন চলছে।

* বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাগরদ্বীপ অঞ্চলে বর্তমানে মেরিন রিগ্রেশনের ফলে বহু নতুন নতুন ব-দ্বীপের জন্ম হচ্ছে এবং সাগর পিছিয়ে গিয়ে মেরিন রিগ্রেশন হচ্ছে।

সমগ্র আলোচনা থেকে বেড়িয়ে আসে যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন কোটি কোটি বছর ধরে ঘটে চলা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং কখনওই বিশ্বজুড়ে সমস্ত উপকূলে একসঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান ও পতন ঘটেনি এবং ঘটছে না। সুতরাং পরিবেশবাদীদের দ্বারা একপেশে এবং অবৈজ্ঞানিক প্রচারের বিরুদ্ধে পরিবেশ আন্দোলন তথা বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে মোকাবিলা করতে হবে। ■

তথ্যসূত্র ঃ *The Changing Earth : Exploring Geology and evolution. 2nd ed. Belmont West Publishing Company 1997.
*Sundarban : A review of Evolution & Geomrphology - S. Bandyopadhyoy
* Marine Transgression along east coast of India - L. R. Rao.
* Coostal Vulnerability Assessment - reserchget study.
*ndrdgh.gov.in - Krishna Godavari Basin.
*www.sciencedirect.com.
*agupubs.onlinelibrary.wiley.com - Australian coastal Sea Level Trends.
* The Indian Ocean Coast of Somalia reserchget study.
* Bangladesh's Dynanic Coastal regions-sciencedirect.com.

স্মরণে ঃ

বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানী জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার

"আমরা (বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে) ইতিমধ্যেই বিজ্ঞান চেতনার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণাকে, যা বহু (এমনকি শিক্ষিত) ভারতীয়দের দ্বারা বাহিত হয়ে আসছে, ত্যাগ করেছি। আগামীর দিকে তাকিয়ে, আমাদের সমাজের প্রয়োজন মৌলিক গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার পরিকাঠামো বজায় রাখতে তার ভূমিকাকে অনুধাবন করা।" এই কথাগুলো বলেছিলেন অধ্যাপক জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। সমাজের অগ্রগতির চাকাকে সচল রাখতে ভারতীয়দের মনকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় বিকশিত করার কথা নারলিকার অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন।

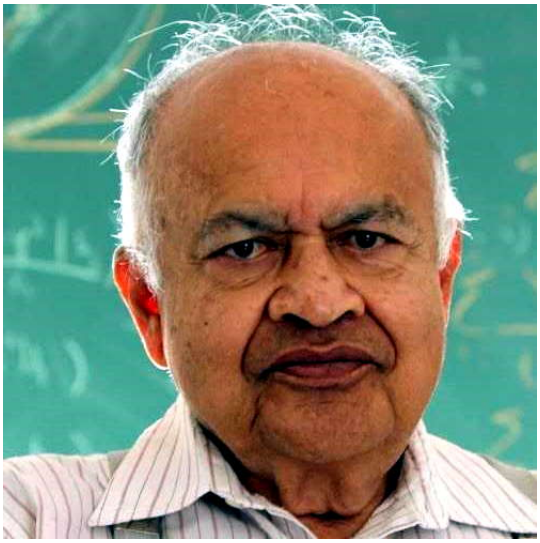

বহু বিজ্ঞানী বিজ্ঞান গবেষণা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছেন। কিন্তু সকল বিজ্ঞানীকে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে যেভাবে উদ্যোগী হতে দেখা যায় না। ব্যতিক্রম হয়তো অনেকেই আছেন, সেই ব্যতিক্রমের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। গত ২০ মে ২০২৫ তাঁর মৃত্যুতে জ্যোতির্বিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

রহস্যময় এই মহাবিশ্ব। আর মহাবিশ্ব সৃষ্টি আরো রহস্যময়। পরীক্ষামূলকভাবে তেমন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও তাত্ত্বিকভাবে বিগ ব্যাং থিওরি মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিগ ব্যাং থিওরি অনুসারে আমাদের মহাবিশ্ব একসময় ছিল একটি বিন্দু। সেই বিন্দুর ভর ছিল খুবই বেশি। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে বস্তুর ভর যত বেশি হবে সেই বস্তু মহাকাশে তত বেশি বক্রতা সৃষ্টি করবে। বিপুল পরিমাণ ভর যদি এক বিন্দু সমস্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে, তাহলে কি বিশাল পরিমাণ স্থান কাল বক্রতা তৈরি হবে তা ধারণাতীত। তখন ওই বিন্দুকে স্পেস টাইম সিঙ্গুলারিটি বলা হয়। ধারণা করা হয় মহাবিশ্বের সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল এর কেন্দ্রে এমন বিন্দু পাওয়া সম্ভব। মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য কি কোনোভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? এমন প্রশ্ন অনেকের মাথায় এসেছিল কিন্তু তার মধ্যে এমন একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন যার অবদান কোন অংশেই কম নয়। তিনি জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। বিখ্যাত ইংরেজ জ্যোর্তিবিদ স্যার ফ্রেড হয়েলের সঙ্গে যৌথভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেছেন।

নারলিকার হয়েলের সঙ্গে কনফারমেশন গ্রাভিটি থিওরি নিয়ে কাজ করছিলেন। পরে এটি হয়েল-নারলিকার থিওরি নামে পরিচিত হয়। এই তত্ত্ব মহাকর্ষ নিয়ে আইনস্টাইনের ধারণাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করে। নারলিকারের আর এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো কোয়াসি স্টেডি স্টেট কসমোলোজি মডেল। এই মডেলকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির বিগ ব্যাং থিওরির বিপরীত মডেল বলা হয়। এই তত্ত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর এই মডেল অনুসারে প্রায় স্থির অবস্থায় ধারাবাহিক স্পন্দন প্রক্রিয়া থেকে মহাবিশ্বের জন্ম। মহাবিশ্ব ক্রমান্বয়ে প্রসারিত ও সংকোচিত হয়ে চলেছে।

নারলিকার ছিলেন ইন্টার ইউনিভারসিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমিন্ড্যাস্ট্রোফিজিক্স (IUCAA)-এর প্রফেসর এমোরিটাস। IUCAA কে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এমন এক কেন্দ্র হিসেবে, যেখানে গবেষণার পাশাপাশি তরুণ মনের মধ্যে

প্রশ্ন করার সাহস তৈরি হয়। বিজ্ঞান তাঁর কাছে ছিল কেবল তথ্যের সংকলন নয় – একটি মুক্ত চিন্তার ক্ষেত্র। অধ্যাপক নারলিকর কেবলমাত্র একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। এমনই একজন মানুষ, যিনি বিজ্ঞানকে শুধু গবেষণার বিষয় হিসেবে দেখেননি, দেখেছেন সমাজ জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, লেখক, শিক্ষক এবং সর্বোপরি – একজন নিরলস বিজ্ঞান চেতনার প্রসারক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর অবদান আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। আগেই বলেছি – কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেড হয়েলের সহকারী হিসেবে কাজ করা, কল্পনার গন্ডি পেরিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় মত্ত থাকা – এসবই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়। কিন্তু যে পরিচয় তাঁকে অনন্য করে তোলে, তা হল জনমানসে বিজ্ঞানমনস্কতার বীজ রোপণ করার অবিরাম চেষ্টা। তিনি বলতেন, বিজ্ঞান কেবল পরীক্ষাগারে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না; তা পৌঁছাতে হবে মাঠে-ঘাটে, মঞ্চে, পাঠশালায় এবং প্রতিটি মানুষের চিন্তাভাবনায়।

নারলিকারের কলম ছিল শাণিত, ছিল যুক্তিবাদের অস্ত্র। তিনি ছোটদের জন্য লিখেছেন বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী, বড়দের জন্য লিখেছেন গভীর আলোচনার প্রবন্ধ। সহজ ভাষায় কঠিন বিজ্ঞানকে তুলে ধরার অদ্ভুত এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর বইয়ে যেমন ছিল মহাকাশের বিস্ময়, তেমনি ছিল ভূতের গল্পের অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার খন্ডন। তিনি লিখেছেন এমনভাবে, যেন পাঠকের মনে প্রশ্নের ঝড় ওঠে, যেন কৌতূহলের আগুন জ্বলে ওঠে।

কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট ও আপসহীন। জ্যোতিষবিদ্যাকে যখন ভারতে বিজ্ঞান হিসেবে পাঠ্য করার দাবি উঠল, তখন তিনি কড়া ভাষায় তা নাকচ করেন। বলেন, "যে বিষয়ের পরীক্ষণযোগ্যতা নেই, যাকে পরীক্ষা করেও ভুল প্রমাণ করা যায় না, সেটি কখনোই বিজ্ঞান হতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্র এক অপবিজ্ঞান।" তাঁর এই আপোষহীন মনোভাব, এই দেশে জ্যোতিষের মতো অপবিজ্ঞানের উপর নিঃসন্দেহে বড় প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। এই স্পষ্ট মনোভাবের জন্য তাঁকে অনেক বিরোধিতাও সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তিনি পিছু হটেননি।

শুধু জ্যোতিষ নয়, সমস্তরকম অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হয়েছেন। আজীবন অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার মুক্ত এক বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। আজ যখন পৃথিবী একদিকে প্রযুক্তির উৎকর্ষে ধাবমান, অন্যদিকে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের ধোঁয়াশায় মানুষ আচ্ছন্ন, তখন ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের জীবন ও চিন্তা হয়ে উঠতে পারে বিজ্ঞান চেতনার এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

নারলিকারের জীবন দর্শন বা বিজ্ঞান ভাবনা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বিজ্ঞান শুধু পরীক্ষার নম্বর তোলার বিষয় নয় – এটা এক সাহসী অনুশীলন। যেখানে আমরা প্রশ্ন করি, সন্দেহ করি, ভুল খুঁজি, ভুল স্বীকার করি এবং প্রতিনিয়ত নিজেকে সংশোধন করি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন – 'বিজ্ঞান মানেই কৌতূহল, বিজ্ঞান মানেই প্রশ্ন। আর প্রশ্ন করার সাহসই হচ্ছে মুক্ত চিন্তার প্রথম ধাপ।' অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকারে এই আলো জ্বালাতে হলে চাই আরো নারলিকার, চাই আরো যুক্তিবাদী কণ্ঠস্বর।

আজ যে সময়ে শোষণের পথকে মসৃণ রাখতেই দিন দিন শাসক ও শোষক তাদের অঙ্গুলিহেলনে অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে সর্বসাধারণের মনে টিকিয়ে রাখতে চাইছে, বিজ্ঞানের সাথে অপবিজ্ঞানকে মিশিয়ে বিচার বিশ্লেষণকে গুলিয়ে দিতে চাইছে ঠিক তখনই জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারদের মতো মানুষেরা উঠে দাঁড়াবেন। শোষিতের শোষণ-বঞ্চনার কারণ হিসেবে যতবারই তাদের দেখানো হবে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র কিংবা অদৃষ্টের কর্মফল ততবারই নারলিকাররা বলবেন 'গ্রহ নক্ষত্রের কোন ক্ষমতা নেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের। মানুষকে নিজেকেই উদ্যোগী হতে হবে'। শোষণকে আড়াল রাখার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার করা শাসক ও শোষক যখন সর্বদা সচেষ্টা ধর্ম ও বিজ্ঞানকে মিলিয়ে দেওয়ার, তখনই নারলিকাররা স্পষ্টভাবে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট বিভেদ প্রাচীরকে তুলে ধরছেন। বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান ও ধর্মীয় বাতাবরণে ক্রমশ ছেয়ে ফেলছে আমাদের মনন ও মস্তিষ্ক। ঠিক এই জায়গাতেই জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারদের প্রয়োজন। তাই অধ্যাপক নারলিকরের মৃত্যু এই দেশের আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার জন্যেও এক বিরাট ক্ষতি। তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। ■

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

ভারতে খনিজ-আকরিক অনুসন্ধানের পথিকৃৎ ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু

– পঞ্চানন মন্ডল

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রমথনাথ বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "আমার ধারণায় তিনি আমাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীদের একজন এবং এক মহান ভূতাত্ত্বিক।" আর বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, "জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র উভয়েই দেশখ্যাত বিজ্ঞানী। এঁদেরও আগে আর একজন বাঙালি বিলাত থেকে বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন, তিনি ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু।"

বিংশ শতকের গোড়ায়, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে, ময়ূরভঞ্জের গরুমহিষানিতে লৌহ আকরিকের সন্ধান পান প্রমথনাথ। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি, তিনি জামশেদজি নাসেরওয়ানজি টাটাকে চিঠি লেখেন – "As you are interested in the development of the iron industry of this country, I have to bring to your notice an exceedingly rich and extensive deposit of iron ore which I have just explored in this State."

জামশেদজি টাটা আর দেরি করেন নি। ফলশ্রুতিতে প্রমথনাথের আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে টাটার জামশেদপুরের কারখানা। তাঁকে সংস্থার শেয়ার দিতে চেয়েছিলেন টাটা কর্তৃপক্ষ, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন ভূতত্ত্ববিদ। পি এন বোস নামে পরিচিত এই মানুষটি ছিলেন বাংলার প্রথম ভূতত্ত্ববিদ। তাঁর অবদান এতটাই গভীর যে, স্বাধীনতার আগে বিশাল ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখন্ডে – ব্রহ্মদেশ থেকে রাজস্থান এবং কাশ্মীর থেকে গোদাবরী পর্যন্ত – তিনিই প্রথম বিভিন্ন রকম খনিজ আকরিকের সন্ধান করেছিলেন।

জন্ম ও লেখাপড়া

প্রমথনাথের জন্ম ১২ মে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে, চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙার গৈপুর গ্রামে। তিনি প্রথমে খাঁটুরার আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে মাত্র ১৫ বছর বয়সে দশম এন্ট্রান্স পাশ করেন। নিয়ম অনুযায়ী ১৬ বছর বয়স না হওয়ায় এক বছর অপেক্ষা করে পরীক্ষায় বসে কৃতিত্বের সঙ্গে সেকেন্ড হন। এরপর ফার্স্ট আর্টস (এফএ, আজকের উচ্চমাধ্যমিকের সমতুল্য) পরীক্ষায় পঞ্চম হয়ে ভর্তি হন বিএ ক্লাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম স্থান লাভ করে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। চার বছর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং বিখ্যাত রয়্যাল স্কুল অব মাইন্‌সে প্যালিয়োন্টোলজি (পুরাজীববিদ্যা) নিয়ে বিশেষজ্ঞ হন।

বিলেত যাত্রা ঃ শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা

প্রমথনাথ পড়াশোনার পাশাপাশি বিলেতের সমাজজীবনও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতিফলন মেলে 'ভারতে বিলাতী সভ্যতা' প্রবন্ধে। এখানে তিনি ভারত ও ইংল্যান্ডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন – ভারতের কুপ্রথাগুলোর (যেমন সতীদাহ) সমালোচনা করেন, আবার রেলরোড নির্মাণ ও শিক্ষা বিস্তারের মতো ব্রিটিশ প্রশাসনের ইতিবাচক উদ্যোগের প্রশংসাও করেন। ছাত্রাবস্থায় দাদাভাই নওরোজি, আনন্দমোহন বসু, লালমোহন ঘোষের সঙ্গে 'ইন্ডিয়া সোসাইটি' গঠনে অংশ নেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বিলেতে রাখা সমীচীন মনে না করে ভারত সচিবের অফিসে চাকরি দিয়ে দেশে ফেরায়।

খনিজ-আকরিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার

দেশে ফিরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে মাত্র ২৪ বছর বয়সে জিওলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে যোগ দেন প্রমথনাথ। ছয়

মাস ফিল্ড সার্ভে – ঘোড়া, উট, নৌকা চড়ে দুর্গম অঞ্চলে খনিজ অনুসন্ধান এবং ছয় মাস অফিসে রিপোর্ট তৈরি। এই কাজের সূত্র ধরে বরাকর-রাণিগঞ্জে ও দার্জিলিংয়ে কয়লা, সিকিমে তামা, অসমের রাইপুর ও বালারঘাটে আগ্নেয় শিলা, মধ্যপ্রদেশের (বর্তমানে ছত্তিশগড়) দল্লি ও রাজহরায় আকরিক লোহা, রায়পুরে লিগনাইট কয়লা, জব্বলপুরে ম্যাঙ্গানিজ ও লোহা, নিম্ন নর্মদা অববাহিকায় খনিজ সম্পদ, ব্রহ্মদেশে কয়লা ও গ্রানাইট পাথর এর মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সন্ধান পান তিনি। ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি পুস্তিকা লেখেন : 'টেকনিক্যাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক এডুকেশন ইন বেঙ্গল'।

তিনি ১৩টি গবেষণাপত্র ও একটি 'মেময়ার্স' রচনা করেন। তাঁর লেখায় ঝড়ে পড়ে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা – যেমন, হিমালয়ের খরস্রোতা নদী দেখে তিনি লিখেছিলেন, "কী তেজ, কী বীর্য, কত স্ফূর্তি, কত আনন্দ! ... জীবনের প্রারম্ভে এইরূপই হইয়া থাকে। ... আরও কিছুদূর যাও, বয়স একটা বাড়ুক, এত লাফালাফি এত তেজ রহিবে না, এত উচ্চে হাসিবে না, এত উচ্চে গাহিবে না।"

তরুণ বয়সেই ব্যাপক পরিচিত

তরুণ বয়সেই তাঁর কাজের ব্যাপ্তি এতো বিস্তৃত ছিল যে তাঁর বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ। ২৪ জুন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ কন্যা কমলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন প্রমথনাথ। প্রমথনাথের নাম তখন টাটা ও তাঁর পরামর্শদাতাদের কাছে সুপরিচিত ছিল। টাটাদের দল্লি-রাজহরা কারখানার পরিকল্পনাও হয়েছিল তাঁর এক গবেষণাপত্রের সূত্র ধরে। এরপর সুবর্ণরেখা ও খরকাই নদীর সঙ্গমস্থলে সাকচিতে তৈরি হয় টাটার স্টিল কারখানা, আর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি জন্ম নেয় জামশেদপুর।

নিরলস কর্মজীবন

প্রমথনাথের কর্মজীবন এই ছোট প্রবন্ধে তুলে ধরা মুশকিল। তিনি স্বদেশি শিল্প গড়তে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ সম্মেলন'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন, আসানসোলে কয়লাখনি পরিচালনা করেন, পূর্ব ভারতে প্রথম আধুনিক সাবান কারখানা তৈরি করেন, খনিজ সন্ধানের জন্য সংস্থা গড়েন। তিনি জিওলোজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে উচ্চপদে পৌঁছলেও, সেখানে পাশ্চাত্য সাহেবদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সাত বছরে ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট হন, তবে তাঁর ওপর দশ বছরের জুনিয়র টমাস হেনরি হল্যান্ড সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে আসেন। এর প্রতিবাদে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ময়ূরভঞ্জ রাজা ভূতত্ত্ববিদ হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। কারিগরি বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠে বেঙ্গল টেকনিক্যাল কলেজ (বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। এই কলেজের প্রথম সাম্মানিক অধ্যক্ষ ও অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন প্রমথনাথ বসু।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ফিল্ড ওয়ার্ক করার শত ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে লিখে ফেলেন সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় এক ভূবিজ্ঞান বই। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' বইটি। ভূবিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যের উল্লেখযোগ্য সমাবেশ ঘটেছে এই বইতে। এই বইয়ের আলোচ্য বিষয় ভূপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ ও বায়ুমণ্ডল। এই বইতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন – "তুলা হইতে কাপড়, ইন্ডিয়া রবার হইতে ওয়াটার প্রুফ, লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ, এবং লৌহ হইতে ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত করাই শিল্পকর্ম্ম। শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়।"

বিজ্ঞানভাবনা ও বিজ্ঞানমনস্কতা

প্রমথনাথ বসু ছিলেন এক বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি। ব্রিটেন যাওয়ার পর যখন 'জাত গেছে' বলে নিদান দিলেন গৈপুরের সমাজপতিরা, তিনি বললেন, "সমুদ্র পেরোলে জাত যায়, এই কথা মানি না।" প্রায়শ্চিত্ত করলেন না। পাশ্চাত্যের গভীর বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও তিনি কেবল জ্ঞানার্জনেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, বরং নিজের দেশের জন্য বিজ্ঞানচর্চাকে বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনায় যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতাকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন জাতির দুর্বলতার মূল কারণ হিসেবে। তাঁর বিজ্ঞানচর্চায় যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। বিজ্ঞান তাঁর কাছে কেবল পরীক্ষাগারে গবেষণার বিষয় ছিল না – ছিল জীবনের রসদ ও সমাজের উন্নতির চাবিকাঠি। তিনি মনে করতেন, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদী মনোভাব অপরিহার্য। তাই বিলেতে ছাত্রাবস্থায় তিনি 'ইন্ডিয়া সোসাইটি'-র মাধ্যমে জাতীয় চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রসার ঘটানোর প্রয়াস নেন। 'ভারতে বিলাতী সভ্যতা' প্রবন্ধে তিনি পর্যালোচনা করেন কীভাবে বিজ্ঞানমনস্কতা ব্রিটিশ সমাজে অগ্রগতি এনেছে এবং কেন ভারতীয় সমাজে বিজ্ঞান চেতনার প্রসার আবশ্যক। তিনি বলতেন, শিল্পোন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তবে এটা তাঁর কথার কথা ছিল না, ছিল কাজের কথা। তাই তিনি ভারতের এপ্রান্ত থেকে সেপ্রান্তে নানা খনিজ অনুসন্ধান থেকে শুরু করে সেই সম্বন্ধীয় টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রসার ও পরিপূরক শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নেন। তাঁর মতে – "বিজ্ঞান চর্চা শিল্পের বিকাশে অপরিহার্য ও শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়।" এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে ভারতে ভারী শিল্পের বিকাশের অন্যতম পৃথিকৃৎ করে তোলে।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় ভূমিকা

প্রমথনাথ বসু বাংলাভাষার শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা জাগাতে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা অপরিহার্য। এই ধারণা থেকেই তিনি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থ, যেখানে তিনি ভূতত্ত্বের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা করেন। সে সময় বাংলায় বিজ্ঞানের পাঠ্যবই ছিল অতি দুর্লভ। প্রমথনাথের বই সেই শূন্যতা পূরণ করে। তাঁর লেখায় টেকনিক্যাল পরিভাষা ব্যবহার হলেও ভাষা ছিল স্পষ্ট, সরস এবং পাঠযোগ্য।

তাছাড়া তিনি ছিলেন বাংলায় বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রথম প্রবর্তকদের একজন। আগেই উল্লেখ করেছি বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) গঠনের কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সেখানে কারিগরি ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়াসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রমথনাথ বসু তাঁর জীবনে যা যা করেছেন – ভূতত্ত্ব গবেষণা, খনিজ-আকরিক অনুসন্ধান, সাধারণ বিজ্ঞান থেকে প্রায়োগিক বিজ্ঞান, শিল্পোন্নয়ন থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার – সর্বত্র তিনি যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে অটুটভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞানমনস্কতা তাকে সমাজ কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই তাঁর জীবন ও কাজ নবজাগরণের বৈজ্ঞানিক ধারার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছে। ■

তথ্যসূত্র ঃ –

১। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী – শিক্ষা সংস্কারক – দেশব্রতী আচার্য প্রমথনাথ বসু। – দীপক কুমার দাঁ। গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ

২। বিস্মৃতপ্রায় বাঙালি বিজ্ঞানী – রণতোষ চক্রবর্তী। জ্ঞান বিচিত্রা

৩। বাংলাসাহিত্যে বিজ্ঞান – বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গ আকাদেমি

৪। খনিজের সন্ধানে ঘুরছেন বাংলা থেকে মায়ানমার – আবাহন দত্ত। আনন্দবাজার পত্রিকা

●১১ *পৃষ্ঠার শেষাংশ*

অন্তর্জালের অন্ধকারময় স্থান – ডার্ক ওয়েব

বৈশিষ্ট্যের কারণে অন্যান্য মুদ্রার দাম যেমন ওঠানামা করে, বিটকয়েনের ক্ষেত্রেও তাই।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকেই যায়, এই অপরাধের কি কোনো শাস্তি নেই? এদের পরিচয় সত্যিই কি অজানা? ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কয়েকটি ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সী সাইবার অভিযান চালিয়ে কিছু বেআইনী কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয় ও কিছু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে ওই অভিযানে ৬.৫ মিলিয়ন গুপ্তমুদ্রা ও নগদ মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করে। বোঝাই যায় মোট বেআইনী লেনদেনের তুলনায় যার পরিমাণ খুবই কম। এর অর্থ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সী মনে করলে বেআইনী কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে ও বন্ধ করতেও পারে। বিষয়টা অনেকটা সুইস ব্যাঙ্কের কর্মপদ্ধতির সাথে তুলনীয়। একাউন্ট হোল্ডারের পরিচয় গোপন রেখে লুঠ করা বেআইনী টাকা জমা রাখতে ব্যাঙ্ক অঙ্গীকারবদ্ধ, কিন্তু ব্যাঙ্ক-এর মালিকদের কাছে তা গোপন নয়। একই রকমভাবে ডার্ক ওয়েব ব্যবহারকারীরা পরিচয় গোপন করলেও ইন্টারনেট সার্ভারের মালিকদের কাছে তা গোপন নয়। সমগ্র ইন্টারনেটের তথ্য ভান্ডারের মালিক হল এরাই। সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে এই তথ্যসম্পদের হদিশ না থাকলেও, সার্ভারের চাবি তাদের হাতে না থাকলেও, সম্পদের মালিকদের কাছে তার ভান্ডারের চাবি থাকবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সেই সুবাদে বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ও নিয়ন্ত্রক হল এরাই।গোপনীয়তা বজায় রাখাই ডার্ক নেট ব্যবসার মূল মন্ত্র। তাই তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই অপরাধকারীদের পরিচয় গোপন রাখে। আর, রক্ষকই যদি ভক্ষকের রূপ ধারণ করে তাহলে তো কথাই নেই।

পরিশেষে, ইন্টারনেটের বিকাশ সামাজিক উৎপাদনে যেমন এনেছে এক নতুন মাত্রা, অন্যদিকে মানব সমাজে সৃষ্টি করেছে এক অসহ্য অস্থিরতা। মানুষের জীবনে এই অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার উৎস হল বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। দৃশ্যমান দুনিয়া হোক বা ডিজিটাল দুনিয়া সর্বক্ষেত্রেই বিদ্যমান ব্যবস্থার ধারক ও বাহকদের কাছে দুর্নীতি হল নীতি। তাদের ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত অপরাধ তাদের দৃষ্টিতে বৈধ, দৃশ্যমান সমাজেও যা ঘটে চলেছে অবিরত। ডার্কনেট দুনিয়া যেন দৃশ্যমান সমাজ জীবনেরই এক চলমান প্রতিচ্ছবি। লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে চলা এই অপরাধ সর্বস্বান্ত করে চলেছে সাধারণ মানুষকে। হাড়ভাঙ্গা শ্রমে তিল তিল করে গড়ে তোলা সম্পদ লুঠ হয়ে যায়। স্বপ্ন হারিয়ে যায় প্রতিনিয়ত ডার্ক নেটের অন্ধকারে। ■

(Sources : CSO Online, Europol, Carnegie Mellon University, Chainalysis, The Tor Project, Trend Micro, Atlas VPN, Digital Shadows, European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, Cybersecurity Ventures, Rand Corporation, ILO, United Nations Office on Drugs and Crime, Cyber News, Gemini Advisory, Dark Reading, Linkedin, Tech Target)

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

চোখে কেন জল?

খুব দুঃখ পেলে আমাদের কান্না পায়। তখন চোখে জল আসে। আবার শুধু কান্না নয়, খুব আনন্দ হলে বা ভয় পেলে এমনকি রেগে গেলেও আবেগে চোখে জল আসে। এছাড়া চোখে জল আসে আরও নানা কারণে। কিন্তু এই জল আসে কেন? চোখের জলকে ইংরেজিতে বলে tears, ভালো বাংলায় অশ্রু। বিজ্ঞানীরা চোখে জল আসার চমৎকার কিছু জৈবিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জানার আগে আসুন জেনে নেই চোখের জল কোথায় তৈরি হয়। চোখের উপরের দিকে, ভ্রুয়ের নিচে থাকে অশ্রুগ্রন্থি বা ল্যাক্রিমাল গ্রন্থি (lacrimal gland)। এই গ্রন্থি থেকেই তৈরি হয় চোখের জল। এটি চোখের উপরে একটি পাতলা তরল স্তর তৈরি করে, যা চোখকে আর্দ্র রাখে, পরিষ্কার রাখে এবং জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

এবার চোখে জল আসার তিনটি ধরনের সাথে পরিচিত হই। ১. সাধারণ অশ্রু বা বেসাল টিয়ার (Basal tears) : এটি প্রতিদিন স্বাভাবিকভাবে চোখে তৈরি হয়। চোখকে সিক্ত রেখে তাঁকে রক্ষা করা এর কাজ। আমরা অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে আয়নায় তাকালে চোখের ভিতর চিকচিকে জল দেখা যায় – এটাই বেসাল টিয়ার। ২. প্রতিবর্ত অশ্রু বা রিফ্লেক্স টিয়ার (Reflex tears) : যখন চোখে ধুলো বা এরকম কোনও বিরক্তিকর পদার্থ পড়ে – তখন চোখ নিজেকে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত জল তৈরি করে। এছাড়া পেঁয়াজ বা লঙ্কা কাটতে গিয়ে আমাদের অনেকের চোখে জল আসে। অনেকের সিগারেটের ধোঁয়া ঢুকলে চোখ জ্বালা করে ও জল পড়ে। প্রচন্ড হাঁচিতেও চোখে জল চলে আসে। ৩. আবেগাশ্রু বা ইমোশনাল টিয়ার (Emotional tears) : খুব দুঃখ, আনন্দ, ভয়, রাগ বা আবেগে চোখে জল আসে। এই চোখের জল শুধু চোখ নয়, আমাদের মস্তিষ্ক ও মনন – এই তিনের যৌথ কাজের ফল। যেমন, কারও মৃত্যুর খবরে চোখের জল বাঁধ মানে না। দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনকে দেখে আবেগে কেঁদে ফেলা।

এবার চোখে জল আসার বৈজ্ঞানিক কারণ জানা যাক। প্রচণ্ড আবেগে বা কাঁদলে চোখে জল আসার ব্যাপারটি আমাদের স্নায়ুতন্ত্র, মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেম বলা হয়, যার মধ্যে রয়েছে

অ্যামিগডালা ও হাইপোথ্যালামাস। যখন আমরা খুব আবেগপ্রবণ হই – দুঃখ, আনন্দ, ভয় বা রাগে – তখন এই লিম্বিক সিস্টেম সক্রিয় হয় এবং স্নায়ু সংকেত পাঠায়। এই আবেগজনিত সংকেত পৌঁছে যায় আমাদের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে (ANS), বিশেষ করে প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রে, যা অশ্রুগ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে, ফলে এটি অশ্রু (জল) তৈরি করে। এই জল মূলত জল, লিপিড, প্রোটিন, লাইসোজাইম উৎসেচক ও ইলেকট্রোলাইটের মিশ্রণ।

তাহলে আবেগে চোখে জল আসা কি ভালো? হ্যাঁ, খুবই ভালো। প্রচণ্ড আবেগে কাঁদলে চোখে জল আসা হলো একটি জটিল স্নায়ুবৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়া, যার মাধ্যমে আমাদের মস্তিষ্ক আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়, শরীর ও মনের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাছাড়া চোখের জল চোখকে পরিষ্কার রাখে। ধুলো ও রোগজীবাণু দূর করে। চোখ শুকিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচায়। বর্তমান গবেষণা বলছে কান্নার পরে অনেক মানুষ হালকা অনুভব করে অর্থাৎ মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে, কারণ চোখের জলের সঙ্গে কিছু স্ট্রেস হরমোন বেরিয়ে যায়। তবে সবসময় চোখ দিয়ে জল পড়া ভালো লক্ষণ নয়। কিছু সমস্যার কারণে চোখে অতিরিক্ত জল পড়ে, যেমন, অ্যালার্জি বা সংক্রমণ, ড্রাই আই সিনড্রোম, যেখানে চোখ শুকিয়ে গিয়ে অতিরিক্ত জল তৈরি করে। ব্লকড ল্যাক্রিমাল ডাক্ট, জল বেরোবার পথ বন্ধ থাকলে জল গড়িয়ে পড়ে। এছাড়া কর্ণিয়ার ক্ষত বা অশ্রুগ্রন্থির সমস্যার জন্যও যখন তখন চোখে জল আসতে পারে। ■

বেশিরভাগ পুরুষ মহিলাদের চেয়ে লম্বা কেন?

আমরা চারপাশে তাকালেই দেখি – বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় লম্বা। ক্লাসরুমে, খেলার মাঠে বা কোনো মিছিলে দাঁড়ালে তা চোখে পড়ে। কিন্তু কখনও কি ভেবেছি, এর পেছনে কারণ কী? আগে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, এটি শুধু হরমোন বা পুষ্টির কারণে হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে – এই পার্থক্যের পেছনে রয়েছে জিন, অর্থাৎ আমাদের দেহে থাকা গোপন "কোড" বা সূত্র। চলুন, ধাপে ধাপে জেনে নিই – পুরুষরা কেন গড়পড়তা মহিলাদের থেকে লম্বা হয়।

আগে ধারণা ছিল – হরমোনের প্রভাব, পুষ্টি ও পরিবেশ এর জন্য মূলত দায়ী। ছেলেদের শরীরে টেস্টোস্টেরন হরমোন বেশি তৈরি হয়। এই হরমোন হাড় বড় করতে সাহায্য করে। মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন বেশি, যা হাড়ের বৃদ্ধিকে তুলনামূলকভাবে ধীর করে দেয়। আবার যারা ভালো পুষ্টি পায়, শারীরিক পরিশ্রম বেশি করে, সুস্থ থাকে, তাদের উচ্চতা সাধারণ বেশি হয়। আবার এটাও দেখা গেছে – ছেলে ও মেয়ে একই পরিবেশে বড় হলেও ছেলেরা গড়ে লম্বা হয়।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

এখানেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করলেন – শুধু পরিবেশ বা হরমোন বা খাদ্য নয়, হয়তো আমাদের জিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই রহস্য। গবেষণা করে SHOX ও ITM2A এই দুইটি জিনের কথা জানা গেল। SHOX (Short Stature Homeobox) হলো একটি বিশেষ জিন, যা উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে। ছেলেদের দেহে থাকে ১টা X এবং ১টা Y ক্রোমোজোম। X এবং Y–দুটিতেই থাকে SHOX জিন। তাই SHOX জিনের কার্যকারিতা দুদিক থেকেই পাওয়া যায়। আর মেয়েদের দেহে থাকে ২টা X ক্রোমোজোম। কিন্তু আশ্চর্যভাবে, মেয়েদের শরীর একটি X ক্রোমোজোম আংশিকভাবে বন্ধ করে দেয়, যাতে দুটো একসাথে কাজ না করে। ফলে SHOX জিনের কার্যকারিতা কিছুটা কমে যায়। মনে করুন, উচ্চতা বাড়াতে SHOX জিন একটি "বুস্টার"-এর মতো কাজ করে। ছেলেদের কাছে থাকে ২টি সচল বুস্টার (X-এর SHOX+Y-এর SHOX)। আর মেয়েদের কাছে থাকে কেবল ১টি সচল বুস্টার, কারণ অন্য X-এর বুস্টার অনেকটাই বন্ধ থাকে। ফলে ছেলেরা গড়পড়তা বেশি "বুস্ট" পায় – আর তাই লম্বা হয়! এছাড়া গবেষকরা আরও একটি জিন খুঁজে পেয়েছেন – ITM2A, যা X ক্রোমোজোমে থাকে এবং হাড়ের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। মেয়েদের দুইটি X থাকায় এই জিন বেশি সক্রিয় হয়ে হাড়ের বৃদ্ধিকে কমিয়ে দিতে পারে। আবার ছেলেদের একটিই X থাকা এই জিনের প্রভাব কিছুটা কম।

এবার দেখি ক্রোমোজোম সংখ্যা কীভাবে উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যাদের XXY ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম আছে, তাদের মধ্যে অতিরিক্ত একটি X আছে, তারা তাই গড়পড়তা আরও বেশি লম্বা হয়। ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোম পুরুষদের হয়। আবার যাদের X0 টার্নার সিন্ড্রোম, তাদের মধ্যে শুধু একটি X আছে, তারা গড়পড়তা খুব ছোটখাটো হয়। টার্নার সিন্ড্রোম মহিলাদের হয়। এই ঘটনার দ্বারা বোঝা যায়, ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও তার ভেতরের জিন কিভাবে পুরুষ ও মহিলার উচ্চতাকে প্রভাবিত করে।

উচ্চতার বিবর্তন : "আমার লম্বা ছেলেই পছন্দ"

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষ যখন গুহাবাসী ছিল, তখন থেকেই মেয়েদের সুঠাম ও লম্বা পুরুষদের বেশি পছন্দ করত, কারণ তারা বেশি খাবার জোগাড় করতে পারত ও বেশি সুরক্ষা দিতে পারত। এই পছন্দই ধীরে ধীরে লম্বা পুরুষদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে বলে যৌন নির্বাচনের প্রভাব (sexual selection)।

তাহলে খাদ্য ও পরিবেশের কি ভূমিকা নেই! আছে। বর্তমান উন্নত দেশগুলোতে খাবার, স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচ্ছন্নতার মান বেড়েছে। ফলে ছেলেদের গড় উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ৪ সেন্টিমিটার আর মেয়েদের বেড়েছে মাত্র গড়ে ১.৭ সেন্টিমিটার অর্থাৎ পুষ্টি ও পরিবেশের উন্নতি ছেলেদের উচ্চতাকে আরও বেশি সাহায্য করে।

এই সাম্প্রতিক গবেষণা প্রমাণ করল, আমরা কেমন দেখতে হব, কতটা লম্বা হব – তার পেছনে জিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর সেই জিন বিবর্তনের ফলেই প্রাপ্ত হয়েছে। শুধু বাইরের পরিবেশ নয়, দেহের ভেতরের জিনও নিখুঁতভাবে পুরুষ মহিলার উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করছে। ■

তথ্যসূত্র ঃ

* The New York Times : A Genetic Clue to why Men Are Taller Than Women, May 2024;

লিঙ্ক ঃ https://www.nytimes.com/2025/05/19/health/height-men-women-genes.gtml

* গবেষণাপত্রটি ১৯ মে ২০২৫ Proceedings of the National Academy of Sciences তে প্রকাশিত হয়েছে।

লিঙ্ক ঃ https://doi.org/10.1073/pnas.2503039122

সমাজ দর্পণ ঃ

অনুপ্রেরণার অন্য নাম – ছোনজিন আংমো

গত ২৩শে মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম দৃষ্টিহীন মহিলা হিসাবে পদার্পন করেন – ছোনজিন আংমো। গড়ে তোলেন এক অনন্য নজির। তিনি প্রমাণ করেছেন – প্রতিবন্ধকতা কোন বাধা নয়। দৃষ্টিহীন হলেও তার লক্ষ্য ছিল স্থির।

হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্ম হয় তার। মাত্র ৮ বছর বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। না টাকা-পয়সা, না সুযোগ-সুবিধা, না প্রতিবন্ধকতা কোন কিছুই তাকে কাবু করতে পারে নি।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মিরান্ডা হাউস থেকে স্নাতক ও স্নাতকত্তোর ডিগ্রি নেন তিনি। তিনি একজন ভালো অ্যাথিলিটও। রাজ্যস্তরে সাঁতারে স্বর্ণ পদক জেতেন। বিভিন্ন ম্যারাথনে অংশ গ্রহণ করেন। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মানালি থেকে সাইকেল চালিয়ে খার্দুলাং (১৮০০ ফুট উচ্চতা) যান। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ছয়দিনে নীলগিরি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়ে তিনটি রাজ্য অতিক্রম করেন। আরো আরো অনেক কৃতিত্ব আছে তার ঝুলিতে।

আজও যেখানে সমাজে একটা মেয়ে জন্মানো মাত্রই তার ওপর শুরু হয়ে যায় বিধিনিষেধ। একটা মেয়েকে বড় হতে গেলে অনেক সামাজিক, মানসিক, শারীরিক বাধা অতিক্রম করতে হয়, সেখানে দৃষ্টিহীনতা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা। সেই প্রতিবন্ধকতাকেই শক্তি করে সহযাত্রীদের হাতে হাত রেখে, পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের দম্ভ চূর্ণ করে তার মাথায় পা রেখে শূন্যে হাত ছুড়ে ছোনজিন আংমো বলে ওঠেন – "আমার পথ চলা সবে শুরু, বাকি সব চূড়ায় আরোহণ করবো আমি।" ■

"বিজ্ঞান শিখি, তবু ভূতের ভয়"!

সদ্য ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা – একটি স্কুলে শিশুরা 'ভূতের ভয়ে' স্কুলে আসছে না। শিক্ষকরা অভিভাবকদের সচেতন করেছেন, কাজ হয়নি। শেষে বাধ্য হয়ে বিজ্ঞান মঞ্চকে ডাকা হয়েছে গ্রামে। তারা সচেতনতা মূলক কর্মসূচী আয়োজন করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন ভূত নামক কল্পনার পেছনে মনস্তত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার অন্তর্গত বড়বিল্লা গ্রামের একটি প্রাইমারি ও একটি হাইস্কুলে দেখা গেছে যে খাঁ খাঁ করছে শ্রেণীকক্ষ। দশ-বারো জনের বেশি ছাত্র স্কুলে আসছে না ভূতের ভয়ে।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে – যেখানে স্কুল কলেজে অভিজ্ঞ, দক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষক দিয়ে বিজ্ঞান বিষয় পড়ানো হয় সেখানে শিক্ষার্থীরা ভূতের ভয়ে কাঁপছে কেন? এটা কেবল একটি গ্রামের ঘটনা হয়। আমাদের গোটা সমাজের এক নির্মম প্রতিচ্ছবি।

আমাদের আশেপাশে অনেক শিক্ষিত ডিগ্রীধারী উকিল, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক অধ্যাপক আছেন যাঁরা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। হাতে রং-বেরঙের পাথরের আংটি পরেন, গ্রহ-নক্ষত্র দেখে বিয়ে করেন, বিভিন্ন টোটকার আশ্রয় নেন।

বর্তমানে বিজ্ঞানের এত উন্নতি ও অগ্রগতি সমাজের সর্বক্ষেত্রে। তবু কেন মানুষ আজও এগুলি বিশ্বাস করে চলেছে? বিজ্ঞান যদি মানুষের জীবনের সমস্যা সমাধানের কাজে না আসে, কেবলমাত্র পরীক্ষার নম্বর ও মুখস্তের বিষয় হয় তাহলে সেই বিজ্ঞান না পড়াই, না জানাই ভাল। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা বিজ্ঞানকে বানিয়েছে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার জন্য। চাকরি পাওয়ার জন্য।

কিন্তু আমরা ভুলে গেছি বা আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে – বিজ্ঞান মনস্কতা হল জিজ্ঞাসু মন বা প্রশ্ন করতে শেখা, যুক্তি-বিচার নির্ভর, প্রমাণ ছাড়া কিছু না মেনে চলা।

আমরা প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান পড়ছি পড়াচ্ছি – পাঠ্যবই-এ, পরীক্ষায়, গবেষণাগারে। কিন্তু সেই বিজ্ঞান আমাদের চিন্তায়, বিশ্বাসে, আচরণে প্রতিফলিত হচ্ছে না। শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে কেন বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে উঠবে, বিজ্ঞান চেতনা দেবার জন্য। আর সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে কেনই বা বিজ্ঞান সংগঠনের দ্বারস্থ হতে হবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য। তাহলে বুঝতে হবে কি ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় শিক্ষাব্যবস্থায়!

ভূতের ভয় একধরনের সামাজিক ও মানসিক গঠনের ফল। অথচ আমরা শিশুদের শেখাই না কিভাবে ভয় তৈরী হয়? কিভাবে মস্তিষ্ক প্রতিক্রিয়া দেয়, কিভাবে যুক্তির সাহায্যে প্রশ্ন তুলতে হয়।

গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ থেকে শহরের বড় বড় ডিগ্রীধারী নাগরিক সবাই কম-বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তার কারণ –

(১) বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা না দেওয়া, (২) সমাজে তার প্রয়োগ না করা।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভূতের ভয়ে যদি শিশু স্কুলে না আসে, তাহলে প্রশ্ন শুধু সেই শিশুর নয় – এই প্রশ্ন গোটা মানবজাতির বিবেককে করা উচিত। আমরা কাকে গড়ে তুলছি – ডিগ্রীধারী অন্ধ মানুষ, না মুক্ত চিন্তার বৈজ্ঞানিক মন?

শিক্ষা মানে শুধু পঠন পাঠন নয়, বরং ভয়কে জয় করার উপায় শেখা। আর বিজ্ঞান মানে অন্ধবিশ্বাসকে প্রশ্ন করতে শেখা। ■

চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনযুদ্ধের গান

চা-বাগানের শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি হোক, পিএফ হোক, পরিশ্রম করে রোজগার করা পাওনা টাকা চাইতে চাইতেই জীবন কেটে যায়। এ চিত্র রাজ্যের তরাই, ডুয়ার্স বা পাহাড়ে হোক অথবা অসম বা অন্যত্র সর্বত্রই একই।

শ্রমিকদের এই দুর্দশার কথা এবার শ্রমিকদের গাওয়া গানেই প্রকাশিত হবে। ডুয়ার্সের আদিবাসীরা তাদের নিজস্ব সাদরি ভাষায় (ঝাড়খন্ড-ওড়িশা সীমান্ত অঞ্চলে আদিবাসীদের মুখ্য ভাষা) এই গান গেয়ে রেকর্ড করেছেন। ডুয়ার্সের কাদম্বিনী চা বাগানের কিশোর-কিশোরীরা এই গান গেয়েছেন।

ফালাকাটার মাদারিহাট রোডের বাসিন্দা দেবাশিস পাল এলাকার একটি কিন্ডারগার্ডেন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এই স্কুলে মুখ্যত চা বাগানের শ্রমিকদের শিশুরা পড়ত। শিক্ষকতার পাশাপাশি লোকসঙ্গীতই দেবাশিস বাবুর নেশা। স্কুল বন্ধ হয়ে গেলেও আদিবাসী পড়ুয়াদের সঙ্গে ওনার নিবিড় সম্পর্ক। উনি সিদ্ধান্ত নেন সাদরি ভাষায় তার লেখা গান কাদম্বিনী বাগানে কিশোর-কিশোরীদের দিয়ে গাইয়ে রেকর্ড করে ইউ টিউবে আপলোড করবেন। অনেক পরিশ্রম করে উনি এই কাজ করেছেন। গানটি প্রসঙ্গে শ্রী দেবাশিস পাল উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন "শ্রমিকরা সময় মতো মজুরি, পিএফ পান না। সরকার বদলালেও ভাগ্য বদলায় না। এই গান উত্তরবঙ্গের সব চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।"

গানের লাইনগুলি হলো ঃ

"সুরজ উঠল কাম গেলা,
সন্ধ্যা আসিল হাত খালি রে
সাহেব মোর পায়সা দেহি দে!
ঘরে ছুকুরা কানিছে পেটে জ্বালা রে!" ■

[সূত্র ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩/০৫/২৫]

জাল ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে

ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান ওষুধ উৎপাদক এবং রপ্তানিকারক দেশ। দেশে ওষুধ শিল্পের বাজার প্রায় ২.২ লক্ষ কোটি টাকা। ব্যবসায়ী সংগঠনের (বিসিডিএ)র মতে এর মধ্যে ৪ শতাংশ হল জাল ওষুধের বাজার, প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা। অতিমারির আগে যে বাজার ছিল ১ শতাংশ ও তার কম। উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ, আগ্রা, কানপুর; হরিয়ানার সোনপথ; দিল্লী, পাটনা, পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলে এইসব জাল এবং অবৈজ্ঞানিক ওষুধ তৈরি হয়। ভেজাল ওষুধ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আইডিসি (ড্রাগ এবং কসমেটিকস্) আইন তৈরি হয়। ওষুধে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ওষুধের পাতার গায়ে লেখা থাকা এমআরপি (সর্বোচ্চ খুচরা দাম)র ১০ শতাংশ পাইকারি বিক্রেতাদের জন্য এবং ১৬-২০ শতাংশ খুচরা বিক্রেতাদের জন্য লভ্যাংশ নির্দিষ্ট করেছে। ওষুধে এর চাইতে বেশি ছাড় থাকতে তা সন্দেহের উদ্রেক সৃষ্টি করে। সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কনট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) সারা দেশে ভেজাল চিহ্নিতকরণের ও নিয়ন্ত্রণের সংস্থা। এই সংস্থার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট বলছে যে দেশে যেসব ওষুধ বিক্রি হয় তার ১২-২৫ শতাংশই নির্দিষ্ট মানের নয়। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে সিডিএসসিও তার রিপোর্ট সারা দেশে বিক্রিত ৫০টির অধিক ওষুধকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এরমধ্যে কিছু ব্যাচ নম্বরের অ্যান্টাসিড (অম্ল নিয়ন্ত্রণের ওষুধ) এবং প্যারাসিটামল (জ্বর, ব্যাথা-বেদনা নিয়ন্ত্রণের ওষুধ যা বহুল প্রচলিতকে নিষিদ্ধ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরা দোকান থেকে নেওয়া স্যাম্পেল পরীক্ষা করে এই কাজ করা হয়। এর মধ্যে বিখ্যাত অ্যালকেম ল্যাবরেটরির অ্যান্টাসিড প্যান ডি, সংক্রমণ প্রতিরোধক **সেপোডেম এবং শেলক্যাল** আছে যা দেশের কোটি কোটি মানুষ ব্যবহার করেন। বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারক সান ফার্মাসিউটিক্যাল এর প্যানটোসিড (অম্ল প্রতিরোধক), **পালমোসিল** (উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রক) এবং গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিকালস্ এর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রক বহুল প্রচলিত ওষুধ **টেলমা এইচ** ও আছে।

গ্যাসট্রো-এন্টাসটিনাল (খাদ্য নালীর বিপাক সংক্রান্ত), অ্যান্টি ডায়াবেটিক (মধুমেয় রোগ নিয়ন্ত্রক), ভিটামিন এবং নিউট্রাসেন্ট্রিকাল (পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য) প্রস্তুত ওষুধই ওষুধের বাজারে শীর্ষস্থানে আছে। ভেজালে পরিমাণ এগুলিতেই বেশি। ভারতে প্রস্তুত কাশির সিরাপ সেবন করে গাম্বিয়া, উজবেকিস্তান এবং ক্যামেরুন দেশে বহু শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ভারত সরকার সিডিএসসিও'র রিপোর্টের ভিত্তি ১৩৭ প্রকার জাল ওষুধ বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ওষুধ ব্যবসায় এই চিত্র দুর্নীতির পাহাড়ের চূড়ার হিমশৈল মাত্র! ■

[তথ্যসূত্র ঃ টাইমস অব ইন্ডিয়া ৬ই মার্চ ২০২৫, এই সময় ৬ই মার্চ ২০২৫, আনন্দবাজার ৮ই মার্চ ২০২৫]

বিজ্ঞানের খবর

ফেব্রুয়ারী-৩.●ক্যালিফোর্নিয়া ও কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী সৌরশক্তি চালিত কৃত্রিম পাতা তৈরী করেছেন যা হাইড্রোকার্বন সংশ্লেষ করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে তাঁরা অণুঘটক হিসাবে ধাতব তামা ব্যবহার করেছেন যা দুইটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে একসাথে ঘটাতে পারে। এই কাপলিং বিক্রিয়ার একদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিজারিত হয়ে ইথেন ও ইথিলিন জাতীয় হাইড্রোকার্বন তৈরী হয়, অন্যদিকে গ্লিসারল জারিত হয়ে গ্লিসারেট, ল্যাকটেট ও ফরমেট জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যৌগ তৈরী করে। (নেচার ক্যাটালিসিস)

৭.●সাংহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী লবনের দানার চেয়ে ক্ষুদ্র আকারের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন চিপ বানিয়েছেন যা অপটিক্যাল ফাইবারের অগ্রভাগে স্থাপন করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন ডিফ্র্যাক্টিভ নিউরাল নেটওয়ার্ক ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ঐ চিপ-এর সাংকেতিক চিত্রকে আলোর গতিবেগে ডিকোড করা সম্ভব হয়েছে। অতীতে যা ছিল সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এই উদ্ভাবন আগামীদিনে মেডিক্যাল ইমেজিং ও কোয়ান্টাম যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বিকশিত করবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (নিউ সায়েন্টিস্টস)

১০.●নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টারবেরী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা আকাশগঙ্গা ছায়াপথে নক্ষত্রের চারদিকে ঘূর্ণায়মান একটি বহির্গ্রহ সনাক্ত করেছেন যার গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৫৪১ কিমি যা আমাদের সৌরজগতের গতিবেগের প্রায় দ্বিগুণ। এমন গতিবেগ সম্পন্ন বহির্গ্রহের সন্ধান বিজ্ঞানীরা আগে পাননি। (অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল জার্নাল)

●ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা গত ২৭শে ডিসেম্বর পৃথিবীর অভিমুখে ধাবমান একটি গ্রহাণু আবিষ্কার করেছেন যার নাম 2024 YR_4। প্রাথমিকভাবে বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর সাথে ঐ গ্রহাণুর সংঘাতের সম্ভাবনা ছিল ১.৩ শতাংশ। কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে এই সম্ভাবনা ২.১ শতাংশ। ২০৩২ সালের ২২শে ডিসেম্বর গ্রহাণুটি পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে আসবে ও পৃথিবীর সাথে সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরী করবে। ততদিন জেমস ওয়েব দূরবীণের সাহায্যে ঐ গ্রহাণুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবেন বিজ্ঞানীরা। (ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা)

১২.●পদার্থের অবস্থান মূলতঃ পাঁচটি। কঠিন, তরল, গ্যাসীয়, প্লাজমা ও বিইসি (বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনসেট)। পৃথিবীর আবহে পদার্থের কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থার সাথে আমরা পরিচিত হলেও সমগ্র মহাবিশ্বের নিরীখে ৯৯ শতাংশ পদার্থ প্লাজমা অবস্থায় বিরাজ করে। প্লাজমা হল অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ইলেক্ট্রন ও আয়নের মিশ্রণ। মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্রের উপাদানগুলি রয়েছে প্লাজমা অবস্থায়। তাই মহাবিশ্বকে জানতে পদার্থের প্লাজমা অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অসীম। বিজ্ঞানীরা আগেই পরীক্ষাগারে পদার্থকে প্লাজমা স্তরে উপনীত করতে সফল হয়েছেন কিন্তু পরীক্ষাগারের আবহে এর স্থায়িত্ব ছিল ছিল অত্যন্ত কম। সম্প্রতি ফরাসী বিজ্ঞানীরা বিশেষ রিয়্যাক্টরে হাইড্রোজেন প্লাজমা তৈরী করে প্রায় ২২ মিনিট স্থায়িত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়েছেন যা পূর্বের তুলনায় ২৫ শতাংশ বেশি। (ইসিএ)

●ওরেগন হেলথ এন্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারের জন্য একটি নতুন রক্ত পরীক্ষার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন যা ৮৫ শতাংশ নির্ভুল ফলাফল দিতে সক্ষম। (ওরেগন হেলথ এন্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি)

১৩.●কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক দল সম্প্রতি বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে সৌরশক্তি চালিত রিয়্যাক্টরের সাহায্যে সরাসরি ব্যবহারযোগ্য জ্বালানী ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরী করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এই প্রযুক্তি কার্বন ক্যাপচার এন্ড ইউটিলাইজেশন (সিসিইউ) পদ্ধতির এক উন্নত রূপ। পূর্বের পদ্ধতিতে বায়ুমন্ডল থেকে সংগ্রহ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে প্রথমে সংরক্ষিত করা হয় ও জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। বর্তমান পদ্ধতিতে এসবের কোন ঝক্কি নেই, অন্যদিকে সৌরশক্তি ব্যবহার করার ফলে পদ্ধতিটি পুরোপুরি পরিবেশ বান্ধব। (কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়)

১৮.●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা ইউরোপীয়ান সাদার্ন মানমন্দির 'টাইলোস' থেকে একটি বহির্গ্রহের ত্রিমাত্রিক ম্যাপ তৈরী করেছেন। এই ছবি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন ঐ বহির্গ্রহের বায়ুমন্ডলে রয়েছে লোহা ও টাইটানিয়ামের মতো ধাতু কণার স্রোত। ফলে বায়ুমন্ডলের প্রকৃতি এতটাই জটিল যা বিজ্ঞানীদের পূর্ব ধারণার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ইএসও)

২৪.●পৃথিবীর অভিমুখে ধেয়ে আসা গ্রহাণু 2024 YR_4-র গতিবিধির আপডেট জানালো মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা। নাসা'র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ২০৩২ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর ঐ গ্রহাণুর সাথে পৃথিবীর সংঘাতের যে অনুমান বিজ্ঞানীরা করেছিলেন তার সম্ভাবনা ০.০০১৭%। বিজ্ঞানীরা আরও জানাচ্ছেন পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসা গ্রহাণুর গতিপথ পরিবর্তন করায় যে প্রযুক্তি আজ বিজ্ঞান করায়ত্ব করেছে, প্রয়োজনে তার ব্যবহার করে পৃথিবীকে বিপদমুক্ত রাখা হবে।(নাসা)

২৭.●কোয়ান্টাম কম্প্যুইটিং হল অতিদ্রুত ও নিখুঁত হিসাবনিকাশের এক অত্যাধুনিক পদ্ধতি। গবেষণার ফলে এই

পদ্ধতিতে হিসাবনিকাশের নির্ভুলতার মাত্রা ক্রমবর্দ্ধমান। সম্প্রতি অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস ও ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি-র গবেষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় ত্রুটির পরিমাণ ৯০ শতাংশ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, কোয়ান্টাম কম্প্যুটার খুবই সংবেদনশীল বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক তাপ, কম্পন, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক বিকিরণ, ওয়াইফাই ইত্যাদির সূক্ষ্মতম তারতম্য এর কার্যকারীতাকে ব্যহত করে। আগামীদিনে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। (অ্যামাজন)

মার্চ-২.●সম্প্রতি মার্কিন বেসরকারী মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ফায়ারফ্লাই এরো স্পেস' চাঁদের মাটিতে সফলভাবে মহাকাশযান অবতরণ করিয়েছে। এই অভিযানে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা প্রযুক্তিগত সহায়তা করেছে। এই অভিযানে চাঁদের মাটি পরীক্ষা করা ছাড়াও পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে সৌর ঝড়ের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করা হচ্ছে। (স্পেস ডট কম)

৫.●ইতালীয় গবেষকদের একটি দল আলোকে স্ফটিকাকার সুপার-সলিড দশায় রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই দশা হল পদার্থের এক বিশেষ অবস্থা। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে স্ফটিকাকার হলেও সুপার-সলিড আলোর সান্দ্রতা শূন্য এবং কিছু কিছু ভৌত ধর্ম তরলের মতো (নেচার)

৬.●আমেরিকায় প্রজাপতির সংখ্যা খুব দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। মিচিগান স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন দেশের প্রজাপতির ৫৫৪টি প্রজাতির উপর দীর্ঘ সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে ২০০০ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রজাপতির সংখ্যা ২২% হ্রাস পেয়েছে। শুধু প্রজাপতি নয়, সামগ্রিকভাবে বেশ কিছু পোকামাকড়ের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। (মিচিগান স্টেট ইউনির্ভাসিটি)

১০.●আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে অতি ক্ষুদ্রাকার প্লাস্টিক কণা (মাইক্রোপ্লাস্টিক)-এর দূষণের ফলে শৈবাল ও উদ্ভিদের সালোক-সংশ্লেষ ১২% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে উদ্ভিদজাত ও সমুদ্রজাত খাদ্য উৎপাদনে বিশাল ধাক্কা আসবে। বিজ্ঞানীদের অনুমান আগামী দুই দশকের মধ্যে প্রায় ১১ কোটি টন উদ্ভিদজাত শস্য ও প্রায় ৩৬ কোটি টন সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদন কম হবে। গবেষকেরা জানিয়েছেন প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্ক্রমণে লাগাম না টানলে এর প্রভাব আগামীদিনে আরও ভয়ঙ্কর হতে চলেছে। (দ্য গার্ডিয়ান)

১১.●ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়নের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা কানাডা-ফ্রান্স-হাওয়াই এর শক্তিশালী দূরবীন ব্যবহার করে শনিগ্রহের আরও ১২৮টি নতুন চাঁদের সন্ধান পেয়েছেন। এই নিয়ে ঐ গ্রহের মোট চাঁদের সংখ্যা হল ২৭৪টি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এক কিমি-র ছোট ব্যাস বিশিষ্ট বিভিন্ন আকারের এই চাঁদগুলির অস্তিত্ব বহু পূর্বের রেকর্ডে ছিল না। পুরানো রেকর্ডের চাঁদগুলির সংখ্যায় ছিল অনেক কম ও আকারে ছিল অনেক বড়। বিজ্ঞানীদের অনুমান সম্ভবত উড়ে যাওয়া ধূমকেতু বা গ্রহগুলির নিজেদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষের ফলে তা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। (নিউ সায়েন্টিস্ট)

১৩.●পার্কিনসন্স হল একটি মারাত্মক স্নানবীয় রোগ। যার প্রকোপ একবার শুরু হলে তা অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে যার কোন প্রতিষেধক বা ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। এই রোগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত একটি প্রোটীন (PINK1) সম্বন্ধে মানুষের ধারণা থাকলেও এর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার জ্ঞান বিজ্ঞানীদের নেই। অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন বিজ্ঞানী সম্প্রতি এই প্রোটীনের গঠন আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে এই রোগ মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা কিছুটা অগ্রসর হলেন। (ফিউচার টাইমলাইন)

২০.●পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩৪০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক ছায়াপথে অক্সিজেনের উপস্থিতি নিশ্চিত করলেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই আবিষ্কার মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য উন্মোচন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। (ইএসও)

২৬.●সূর্য থেকে নির্গত উচ্চশক্তি বিশিষ্ট তড়িতাহিত কণা কোন গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে সংঘাতের ফলে গ্রহের বায়ুমন্ডলের উচ্চ স্তরে এক বিশেষ ধরনের আলোকজ্যোতি সৃষ্টি করে। এই সুদৃশ্য আলোকজ্যোতিকে মেরুপ্রভা বলা হয়। আমাদের সৌরজগতের গ্রহদের মধ্যে পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি, মঙ্গল, শুক্র ও ইউরেনাস-এর আকাশে মেরুপ্রভা লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি নাসা'র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের সাহায্যে নেপচুন-এর আকাশে মেরুপ্রভাব দেখা গেছে। এই ঘটনা ঐ গ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষয়ে অনেক অজানা রহস্য সমাধান করবে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন।(নাসা)

১লা এপ্রিল.●মহাকাশ বিজ্ঞানীরা স্পেস এক্স-এর মনুষ্যযান ফ্যালকন-৯ রকেট সফলভাবে মহাকাশে পাঠালেন। এই বেসরকারী উদ্দ্যোগের বিশেষত্ব হল রকেটটি পৃথিবীর মেরু অক্ষ বরাবর প্রদক্ষিণ করছে ও বিষুবতলের সাথে ঘূর্ণনতল ৮০ থেকে ৯০ ডিগ্রী কোণে আনত। এমন বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোন মহাকাশযান আগে পাঠানো হয়নি। (স্পেস নিউজ)

২.●বিজ্ঞানীরা ক্ষুদ্রতম পেসমেকার বানাতে সক্ষম হলেন। নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ৩.৫ মিলিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি পেসমেকার বানালেন যেটি ইঞ্জেকশনের সূচের আগায় স্থাপনা করে রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো যেতে পারে সহজেই এবং শরীরে কোন কাটাছেঁড়া না করেই। বিজ্ঞানীরা আরও জানিয়েছেন যে পেসমেকারটি রোগীর অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার

●*শেষাংশ ৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন* ➔

পঞ্চম বর্ষ❖সংখ্যা - ২❖জুন ২০২৫

সমাজ বিজ্ঞান ঃ

দৈহিক শ্রম কি মানসিক শ্রম থেকে আলাদা?

আজকের পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু বেঁচে থাকার সামগ্রী পায়, সুযোগ সুবিধা পায়, স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে – এই সবই যুগ যুগ ধরে মানুষের পরিশ্রমের ফল।

প্রকৃতি যেমন সর্বদা রূপান্তরিত হয়ে চলেছে, তেমনি আমাদের সমাজের যাবতীয় সামগ্রী ও সুযোগ সুবিধা পাল্টাচ্ছে অবিরত। এর ফলে ও এর সাথে মানব সমাজও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। মানব সমাজের কি নিয়মে পরিবর্তন হয় তা এবারের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু আমাদের সমাজ যে পরিবর্তিত হয়ে আজকের আধুনিক সমাজে এসেছে সেটা মানতে কোনো সন্দেহ নেই। আজকের সমাজে এমন এক উৎপাদন পদ্ধতি চলছে যেখানে যা কিছু ধনসম্ভার আছে, সবই 'পণ্যে এক বিপুল সমাহার।'

এই ধনসম্ভারের জন্মদাতা কারা? নিঃসন্দেহে বলা যায় এগুলোর জন্ম দিয়েছেন এবং দিয়ে চলেছেন শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু যারা কোনো কাজ করে না, তারাই এর সিংহভাগের অধিকারী। অথচ যাঁরা পরিশ্রম করে এগুলো সৃষ্টি করে চলেছেন তাঁরা সমস্ত সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই এঁদের মধ্যে যাঁরা মূলত কায়িক শ্রম করেন, তাঁরা সমাজে সব থেকে বেশি শোষণের শিকার। এই সমাজে কায়িক শ্রমিকের কোনো মর্যাদা নেই। কেন এমন হয়? এর উত্তর খুঁজে দেখতে আমাদের সবার প্রথমে শ্রম কি সেটা বোঝা দরকার। শ্রমকে মাপা হয় একজন শ্রমজীবী কি পরিমাণ কাজ করছেন তাই দিয়ে। এই কাজ আর সব কাজের মত বস্তুর গতি জনিত। যাঁরা কায়িক শ্রমিক, তাঁদের অস্থি ও পেশির সঞ্চালনে এই কাজ সম্পাদন হয়। আবার যাঁরা মানসিক শ্রমিক, তাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গতি জনিত কাজই হল মানসিক শ্রম। জীব বিজ্ঞান অনুসারে দৈহিক হোক বা মানসিক, যেকোনো প্রকার শ্রম ক্রিয়াশীল হয় একত্রে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র যেমন একই দেহের অংশ তেমনি অন্যান্য অংশের সাথে তার ক্রিয়ার সময় পারস্পরিক তালমেল না থাকলে কাজটাই হয় না। এই সঠিক তালমেলের উপযোগী মস্তিষ্ক-স্নায়ুতন্ত্র এবং হাতের অস্থি-পেশীকে আমরা পেয়েছি বিবর্তনের নিয়মে। কিন্তু অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে শ্রম করার দরকার ছিল সেটা করতেই হোত। সেই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে মানসিক ও কায়িক শ্রমের সঠিক সম্মেলন প্রয়োজন ছিল। মানব প্রজাতির যে বা যারা এই কাজের উপযুক্ত ছিল, সে বা তাদের উত্তরসুরীরা এই শ্রম করায় প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে। ফলে শুধু হাত আর মস্তিষ্ক নয়, তার প্রভাবে দেহের অন্যান্য অংশেও বিবর্তন একই নিয়মে হয়েছে। বিবর্তনের নিয়ম মেনে বলা যায় আগামী পৃথিবীতে যেহেতু কায়িক শ্রম অনেক কমে যাবে, তাই আগামী পৃথিবীর মানুষ হবে অনেক খাটো এবং তার মাথার আকার, ওজন হবে অনেক বেশি – এমনটাই বলছেন বিজ্ঞানীরা। এই নিয়মেই আদিম মানুষ থেকে আজকের মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ও ভর ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

এই বিবর্তন জাত বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করে সফলভাবে কাজ করতে গেলেও কিন্তু মানুষকে ছোট থেকে অনুশীলন করে সেই দক্ষতা অর্জন করতে হয়। এক থালা ভাত মেখে খাওয়া একটি এক বছরের শিশুর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বারে বারে চেষ্টা করলে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে ক্রমান্বয়ে সক্ষম করে তোলে। এই শ্রমের ফলে তার অঙ্গ সঞ্চালন-পেশী সঞ্চালন থেকে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। যদিও এই সমগ্র কাজের জন্য উপযুক্ত সামগ্রিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই সে জন্মায়। সেই বৈশিষ্ট্য সে বাবা-মায়ের থেকেই পেয়েছে।

পূর্ণবয়স্ক মানুষ হোক বা একটি শিশু সবেমাত্র যে কাজে হাত দেয়, সেই কাজ হল অদক্ষ শ্রম। কিন্তু কাজটা শুরুর আগে কি করতে চলেছি, কি ফল পেতে চাই – অর্থাৎ পূর্বপরিকল্পনা চলে মস্তিষ্ক সহ স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়ায়। এটাও হয় ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে আগে থেকে পাওয়া তথ্য (information) গুলির সংশ্লেষণের ফলে। আদিম মানুষ বাইসন শিকারের গুহাচিত্র আঁকতে পারতো না, যদি না তার থেকে শক্তিশালী এই প্রাণীর আক্রমণের শিকার হোত। ঐ আক্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে আসে প্রথমে প্রতিরোধের শিক্ষা এবং তারপর প্রতি আক্রমণের নিখুঁত পরিকল্পনা। বাইসনের গুহাচিত্র হোক বা পাথরের ভোঁতা অস্ত্র তৈরি, সবটাই করেছে যে প্রথম মানুষ, তার অদক্ষ শ্রম এই নির্মাণ করেছে। প্রাকৃতিক বস্তুর রূপান্তর ঘটানোর আগে যে অস্পষ্ট আবছা ধারণা তৈরি হয়, সেই অনুযায়ী মানুষ তার অদক্ষ শ্রম প্রয়োগ করে, যা অবশ্যই মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র সহ অন্যান্য দেহাংশের গতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। দেহ-মনের বোঝাপড়ার জন্য অনেক ব্যর্থ শ্রম প্রয়োজন। প্রতিবারের ব্যর্থতায় স্নায়ুতন্ত্রে যে তথ্য সংশ্লেষণ হয়, তাই হল ব্যর্থতার শিক্ষা। এই শিক্ষা থেকেই স্নায়ুতন্ত্র নতুনভাবে ক্রিয়াশীল হয়, দেহ নতুনভাবে কাজ করে। এইভাবে একজন অদক্ষ শ্রমিক দক্ষ শ্রমিকে পরিণত হয়। এই দক্ষ শ্রম যে অদক্ষ শ্রমের যোগফল, সেই অদক্ষ শ্রম সে আগে করে থাকতে পারে, কিংবা সেই

অভিজ্ঞতা কিছুটা অন্যের শ্রম থেকেও লাভ করতে পারে। তাই দক্ষ শ্রম হল অদক্ষ সামাজিক শ্রমের ঘনীভূত রূপ। দৈহিক এবং মানসিক শ্রম পরস্পর ওতপ্রোত। তাই প্রকৃত রূপে শ্রমকে দৈহিক বা কায়িক ও মানসিক, এভাবে ভাগাভাগি করা যায় না। তাকে ভাগ করা যায় দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমরূপে। তবু সমাজে কায়িক ও মানসিক শ্রমিকে ভাগাভাগি দেখা যায়। এটা কিভাবে হয়?

দেখা যায় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে বাকি দেহের তালমেল ছাড়া কাজ হয় না ঠিকই, তবে এই দুই এর আনুপাতিক তারতম্য থাকে। এই দুই এর মেলবন্ধনের প্রয়োজন সব ক্ষেত্রে সমান নয়। যেমন পাথর ভাঙার সময় এই মেলবন্ধনের জন্য চেষ্টা বেশি করতে হয় না পাথরের ভাস্কর্য নির্মাণের থেকে। কারণ যে কাজ বারবার করতে হয় যেমন মোটামুটি এক আকারের বোল্ডারকে একইভাবে ভেঙে প্রায় একই রকম টুকরো করা, এমন অনেক কাজে সময়ান্তরে বৈচিত্র্য কম বা প্রায় নেই বললেই চলে। এমন আরও উদাহরণ হল মাটি কাটা, মাথায় করে ভার বহন করা, ক্রমাগত একইভাবে স্ক্রু টাইট দিয়ে চলা ইত্যাদি কাজ। দীর্ঘ সময়ান্তরে এসব ক্ষেত্রে টানা কিংবা ঠেলার মতো বলপ্রয়োগে বৈচিত্র্য অনেক কম হয়। ফলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াও অনেক সীমিত হয়ে যায়। কিন্তু যে কাজ সময়ান্তরে বদলে যায় বারবার, সে ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া গুণে ও পরিমাণে বেড়েই চলে। পাথর ভাঙার বিপরীতে পাথর খোদাই করা ভাস্কর্য নির্মাণ এমন একটি উদাহরণ।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সম্পদের মালিকরা সম্পূর্ণ একটা কাজকে প্রথমে ভেঙে দিল অনেক গুলি অংশে। তারপর সম্পূর্ণ কাজটা আগে যেখানে একজন করতো, সেই কাজে একাধিক শ্রমিক নিযুক্ত করল এক একটি অংশের জন্য। সেখানে একজন শ্রমিক কোনো কাজের অংশ বিশেষ সমাপ্ত করে অপর শ্রমিককে তা হস্তান্তর করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে গোটা কাজ সমাপ্ত হয়। এতে একই কাজ এক একজনকে বারবার করে করতে হয়। তাতে মোট শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লেও একজন শ্রমিকের কাজ হয়ে যায় একঘেয়ে। এতে প্রতিজন শ্রমিকের কাজে ন্যূনতম স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের ব্যবহার হতে থাকে। অধিকাংশ সম্পদের উৎপাদন এভাবে হওয়ায় অধিকাংশ শ্রমিক হয়ে যান কায়িক শ্রমিক। এরপর সম্পদের মালিকরা মানুষের শক্তিকে যন্ত্রের শক্তি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে যতদূর সম্ভব। ফলে শ্রমের বাজারে সংখ্যা গরিষ্ঠ হন কায়িক শ্রমিকরা এবং তাঁরা হন প্রয়োজনাতিরিক্ত।

অন্যদিকে যে সংখ্যালঘু শ্রমিক প্রধানভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে কাজে লাগান, যাঁদের শ্রমকে মানসিক শ্রম বলা হয়, তাঁদের শ্রমকে এভাবে গুণগতভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। একজন বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, সুরকার, লেখক ইত্যাদি এমন মানসিক শ্রমিক। শ্রমের বাজারে এঁদের সংখ্যা অনেক কম হয়।

একজন শ্রমিক যিনি প্রধানভাবে কায়িক অথবা মানসিক শ্রম করেন, তিনিও এই পণ্য অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময়ে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পণ্য হল তাঁর নিজস্ব শ্রমশক্তি বা তাঁর শ্রম করার ক্ষমতা, তাঁর যে পরিমাণ শ্রম ঐ পণ্যটি তৈরিতে ব্যয়িত হয়েছে, তা নয়।

শ্রমিকের শ্রমশক্তি হল শ্রমের সেই অংশ যার মূল্য একজন শ্রমিক পেয়ে থাকেন উৎপাদনের পর। শ্রমের বাজারে একজন শ্রমিক যখন আসেন, তখন তাঁর কাছে দুটো হাত আর একটা মাথা রয়েছে মাত্র। তাঁর চাই নিজের এবং পরিবারকে প্রতিপালন করার জন্য নানা প্রকার পণ্য। কাজ করে ঐ শ্রমিকের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে যে ক্ষয় হয়, দেহের অন্যান্য অংশে যে ক্ষয় হয় প্রতিদিন, সেই ক্ষয় পূরণ না হলে তাঁকে পরের দিন কাজে লাগানো যাবে না আগের মতো। এই জন্য তাঁকে যে শ্রমের মূল্য নিয়োগকর্তা মজুরি হিসেবে দেন, সেই টুকু শ্রমের মূল্য হল শ্রমশক্তির মূল্য।

শ্রমশক্তির মূল্যে যদি ঐ শ্রমিকের যাবতীয় ক্ষয় পূরণ হবে, তবে কেন অধিকাংশ কায়িক শ্রমিক কাজের পর এমন মজুরি পান যাতে তাঁর সংসার ভালোভাবে চলে না। ঘটনাটাকে দেখতে হবে সামগ্রিক অর্থে। ঐ নির্দিষ্ট কাজে কর্মরত ও ভবিষ্যতে কর্মযোগ্যদের সাপেক্ষে মোট মজুরি স্থির করা হয়। কারণ শ্রমশক্তির মূল্য কম দিলে শ্রমিকের ক্ষয় পূরণ হবে না। কিন্তু শ্রমের বাজারে সর্বদা মজুত থাকে একদল কাজ না পাওয়া শ্রমিক বা বেকারবাহিনী। কারণ আগেই বলা হয়েছে শ্রমের বাজারে কায়িক শ্রমিকরা প্রয়োজনাতিরিক্ত। উৎপাদনের বিকাশের ফলে এক সময় পণ্য উৎপাদন বাজারের চাহিদাকে অতিক্রম করে যায়। মনে রাখার বিষয় হল এই চাহিদা হল ঐ পণ্য কেনার সামর্থ্য যাদের আছে তাদের চাহিদা। জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ শ্রমজীবীর এই সামর্থ্য নির্ধারিত হয় তাদের মজুরির দ্বারা। একারণে উৎপাদন হয়ে যায় অতিউৎপাদন। অতিউৎপাদনের সংকট কাটাতে মালিকপক্ষকে খরচ কমাতে হয়। শ্রমিকের মজুরি ছাড়া সবকিছুই তাকে বাজার থেকে সমমূল্যে কিনতে হয়। কেবলমাত্র শ্রমিকের মজুরিতে কাটছাঁট করা যায়। আরো বেশি যন্ত্র ব্যবহার করে, ছাঁটাই করেও কর্মরতদের উপর আরো কাজের বোঝা চাপিয়ে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করে। প্রয়োজনের তুলনায় কম মজুরি পেয়ে অভুক্ত-রুগ্ন-অসুস্থ হয়ে একজনের মৃত্যু হলেও তাঁর জায়গা পূরণ করতে আরেকজন হাজির একই দরে কাজ করতে। একে অন্যভাবে বলা যায় যে প্রয়োজনীয় পণ্যের চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি হওয়ায় তার দাম কমে গেছে। কায়িক শ্রমিকদের দুরাবস্থার এটাই কারণ।

কিন্তু আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদনে শ্রমের

সর্বাধিক উৎপাদনশীলতা পেতে সম্পদের মালিকরা যে কৌশলে চলে তাতে সমাজে শ্রমজীবীদের মধ্যে অধিকাংশই হয় কায়িক শ্রমিক। এর ফলে অপ্রতুল মানসিক শ্রমিকরা এক একজন অপেক্ষাকৃত বেশি শ্রমশক্তির মূল্য পায়। এর মানে এই নয় যে এক্ষেত্রে মোট শ্রমশক্তির মূল্য মোট প্রাপ্ত শ্রমের মূল্যের অনুপাতিক পরিমাণে বেশি হয়। কারণ উৎপাদনের মালিকের উৎপাদন ব্যবস্থা টিকে আছে মোট শ্রমের মূল্য এবং মোট শ্রমশক্তির মূল্যের অন্তরের উপর। এই অতিরিক্ত মূল্যই পুঁজি।

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী হওয়ায় একদিকে একজন কায়িক শ্রমিকের আয় মানসিক শ্রমিকের থেকে অনেক কম থাকে। উভয়ের বাঁচার পরিবেশের অনেক পার্থক্য হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্যে পুষ্টি, সাংস্কৃতিক পরিবেশে থাকে অনেক পার্থক্য।

এমন অবস্থায় একজন কায়িক শ্রমিকের পরিবার থেকে কঠোর পরিশ্রম করে কেউ উচ্চশিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হলে, সে ঐ শ্রমের বাজারে গিয়ে যদি মানসিক শ্রমিকের যোগ্যতা পূর্ণ করতে পারে, তবে তার জীবনের মান উন্নত হতে পারে। কিন্তু এটাই গরিব শ্রমিকের জীবনের মানের উন্নতির উপায় নয়। বেশিরভাগ শ্রমজীবী এই যোগ্যতা অর্জন করলে মানসিক শ্রমিকরা আগের মতো অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরি পাবেন না। সমগ্র শ্রমজীবীদের জীবনের মান উন্নত করতে হলে শ্রমের মূল্য ও শ্রমশক্তির মূল্যের পার্থক্য ঘোঁচাতে হবে। সমাজ বিজ্ঞান অনসুারে এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

চলমান সমাজে কায়িক ও মানসিক শ্রমিকের মধ্যে যে মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে তা মন থেকে দূর করতে সকলের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম যেমন জরুরি, তেমনি একজন কায়িক শ্রমিককে যাবতীয় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, তাঁর জীবনের মান উন্নত করতে হবে। আজকের এই অসম প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতে হবে। অন্যদিকে প্রত্যেক মানসিক শ্রমিককে সমাজে যেটুকু কায়িক শ্রম থাকবে তাও করতে দিতে হবে। এভাবে সমস্ত উপায়ে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের পার্থক্য ঘুঁচবে। কারণ প্রকৃত অর্থে শ্রমকে কায়িক ও মানসিক – এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় না। শ্রমের দুই রূপ – অদক্ষ শ্রম এবং দক্ষ শ্রম। ■

●২৭ *পৃষ্ঠার শেষাংশ*

বিজ্ঞানের খবর

করা যাবে, অর্থাৎ যে রোগীর যতদিন পেসমেকারটি প্রয়োজন ততদিন রোগীর শরীরে তা কার্যকর অবস্থায় থাকবে ও প্রয়োজন মিটে গেলে তা আপনা আপনি শরীরে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। হৃদযন্ত্রের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ এক অনন্য উদ্ভাবন। (নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়)

৭.●১০ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া খ্যাঁকশিয়ালকে ফিরিয়ে আনলেন কোলোজাল বায়োসায়েন্স-এর বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীরা প্রথমে বিলুপ্ত প্রজাতির সংরক্ষিত জিনকে ব্যবহার করে জিন প্রযুক্তির সাহায্যে জিনোম তৈরী করেন। ঐ জিনোম গৃহপালিত কুকুরের ভ্রূণে প্রতিস্থাপিত করেন। এর ফলে জন্ম হয় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া খ্যাঁকশিয়ালের। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বেশিকিছু প্রাণী যেমন, ম্যামথ, ডোডো ইত্যাদিকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।(টাইম)

১৬.● আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি-র কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন যে তাদের বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক-নলের মধ্য দিয়ে পতনশীল বৃষ্টির জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ধাতু, প্লাস্টিক, রাবার ইত্যাদির ঘর্ষণের ফলে তৈরী হয় স্থির তড়িৎ। একই ভাবে পতনশীল জলকণার সাথে প্লাস্টিকের ঘর্ষণে সৃষ্ট স্থির তড়িৎ থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ঘটাতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা। ৩২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ ও ২ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট একটি পলিমার নলের মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত করার ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার করে ১২টি এলইডি বাল্বকে ২০ সেকেন্ডব্যাপী জ্বালানো সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন এই পদ্ধতিতে মোট স্থির তড়িতের মাত্র ১০% কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। (ইউরেক এলার্ট)

●আমাদের সৌরমন্ডলের বাইরে প্রাণের অস্তিত্বের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ পেলেন কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ১২৪ আলোকবর্ষ দূরের এক বহির্গ্রহে ডাইমিথাইল সালফাইড ও ডাইমিথাইল ডাইসালফাইডের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এই যৌগগুলির আবিষ্কার ঐ বহির্গ্রহে মহাজাগতিক প্রাণের অস্তিত্বের কথাই বলে। (দ্য গার্ডিয়ান)

২০.●প্রায় ১২ বছর পূর্বে নাসা প্রেরিত 'লুসি' মহাকাশযান, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলের গ্রহাণুপুঞ্জ (ডোনাল্ড জোহান্সন)-এর বিভিন্ন ছবি প্রেরণ করে চলেছে। এর মধ্যে একটি বাইনারী গ্রহাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল বাড়িয়ে চলেছে। বাইনারী গ্রহাণু হল পরস্পর জুড়ে থাকা দুটি গ্রহাণু। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দ্বারা প্রেরিত ছবিতে ঐ গ্রহাণুর কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে যা গবেষণার বিষয় বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। (নাসা)

২৭.●জ্যোতির্বিবজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত একটি মলিকিউলার ক্লাউড বলয় আবিষ্কার করেছেন যার প্রধান উপাদান হল হাইড্রোজেন অণু। বিজ্ঞানীরা যার নাম রেখেছেন ইওস ক্লাউড। হাইড্রোজেন ছাড়া এই ক্লাউড কার্বন মোনক্সাইড-এর উপস্থিতিও সনাক্ত করা গেছে। (রুটগারস)

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরিরাম আহমেদ

(অষ্টম পর্ব ত্রয়োদশ অংশ)

বিগত সংখ্যায় আমরা যে 'কণা-তরঙ্গ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, সেই কণা-তরঙ্গে কণা ও তরঙ্গের গতিবেগ নিয়ে এবার চর্চা করা যাক।

এই কণার গতিবেগ এবং তরঙ্গের গতিবেগ কি অভিন্ন?

সূর্যের আলো (পরিষ্কার আকাশে) আমাদের এই পৃথিবীতে এসে পড়ে। আমরা মানস চোখে পৃথিবীর রঙের বৈচিত্র দেখি। আমরা দেখি কতরকম রঙের হাট বসেছে। সূর্যের আলোকে প্রিজমে প্রতিসরণের পর অনেকগুলো রঙে ভেঙে ফেলে আমরা বর্ণালী তৈরি করার কথা অনেকবার বলেছি। এমনকি উত্তপ্ত কোনো বস্তু থেকেও এমনই বর্ণালীর কথা স্পেকট্রোস্কোপের বিষয়ে আলোচনায় রেখেছি। এই সূর্যের সাদা আলোর ভেঙে যাওয়াকে বলে বিচ্ছুরণ বা ডিসপারশান। এটা হয় কারণ সূর্যের সাদা আলো অসংখ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোর সমষ্ঠি, যাদের প্রত্যেকের গতিবেগ সমান হওয়ায় তারা একই সঙ্গে পৃথিবীর উপর এসে পড়ে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে একই সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের বস্তু অন্য তরঙ্গগুলো শোষণ করে নিয়ে নিজ বর্ণের আলোকে প্রতিফলিত করে। আমরা সেই প্রতিফলিত আলোক তরঙ্গে সংবেদনশীল হয়ে বহুবর্ণের সমাহারকে একত্রে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রিজমের কাঁচ মাধ্যমে সেই সাদা আলোর (যা অনেক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গের সমাহার) বিচ্ছুরণ ঘটে। প্রতিটি বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর বিভিন্ন গতিবেগ থাকায় তারা আলাদা আলাদা দিকে আলাদা আলাদা গতিবেগে ধাবমান হয়। তখনই বর্ণালী দৃশ্যমান হয়।

আমরা সূর্যালোকের উদাহরণে পেলাম একাধিক তরঙ্গকে, যারা কখনো সমান গতিবেগ সম্পন্ন, কখন ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ সম্পন্ন। আবার এমন সমান অথবা অসমান গতিবেগ সম্পন্ন তরঙ্গ একত্রে মিলে তরঙ্গের গোষ্ঠী বা ওয়েভ গ্রুপ তৈরি হয়। এর মধ্যে সাদা আলো সমান গতিবেগের বিভিন্ন বর্ণের আলোর গোষ্ঠী। কিন্তু দুটি সুরশলাকাকে পরপর কাঁপালে আমরা যে অস্থিরভাবে ওঠানামা করা শব্দ শুনবো তাতে প্রতি সেকেন্ডে দু'টো উচ্চ শিখর শুনবো। একে বলে বিট। এক্ষেত্রে এই বিট-এর দুটি শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ আলাদা। যেকোনো তরঙ্গের ক্ষেত্রে তাই অন্তত দুটি বিষয় থাকবে – এক, প্রতিটি আলাদা আলাদা তরঙ্গের গতিবেগ, যাকে বলা হয় তার দশা বেগ বা ফেজ ভেলোসিটি v_p দুই, তাদের একত্রিত রূপ, যাকে তরঙ্গগুলোর রেজালট্যান্ট বা লব্ধী বলা যায়, তার বেগ। অর্থাৎ গ্রুপ ভেলোসিটি (v_g)

এর বাইরে ডি-ব্রগলির কণা-তরঙ্গের কণাটিরও গতিবেগ (v) থাকবে।

এখন ডি-ব্রগলি ওয়েভ যদি একটি কণার একটি তরঙ্গ হয় তবে সেই কণাতরঙ্গের বেগ v_p, কণাটির ভর $= m$, কণাটির গতিবেগ $= v$, কণাতরঙ্গের কম্পাঙ্ক $= \nu$, কণাতরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $= \lambda$ এবং $h =$ প্লাঙ্ক ধ্রুবক, $c =$ আলোর গতিবেগ শূন্যমাধ্যমে [শেষের দুটি মহাবিশ্বে তিনটি আবিষ্কৃত সার্বজনীন ধ্রুবকের দুটি] হলে $v_p = \nu\lambda$ । আবার একটি কণায় উপস্থিত শক্তির পরিমাণ $h\nu$ হলে $h\nu = \dfrac{mc^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$

[আইনস্টাইনের ফোটন কণার শক্তির পরিমাণকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ভর-শক্তির সমীকরণের সাথে সম্পর্কিত করে পাই।]

বা, $h\nu = \gamma mc^2 \left[\text{যেখানে } \gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \right]$

বা, $v = \dfrac{\gamma mc^2}{h}$

$\therefore v_p = \nu\lambda = \dfrac{\gamma mc^2}{h} \times \dfrac{h}{\gamma mv}$

বা, $v_p = \frac{c^2}{v}$

এখানে দেখা যাচ্ছে ডে ব্রগলির তরঙ্গের গতিবেগ (v_p) আলোর গতিবেগের বহুগুণ বেশি প্রতিপন্ন হচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব? কারণ আপেক্ষিকতাবাদকে সঙ্গে নিয়ে, তার স্বীকৃতি দিয়েই ডে ব্রগলির কণা তরঙ্গের ধারণা বা প্রস্তাবনা করেছিলেন। আমরা ডে ব্রগলির কণা তরঙ্গকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছি। তা হলে গন্ডোগোলটা কোথায় হচ্ছে।

তাহলে বস্তুকণার যে তরঙ্গ নিয়ে ইতিপূর্বে চর্চা করা হল, তা প্রকৃতপক্ষে কি? বিজ্ঞানী শ্রয়ডিঙ্গার এই বিষয়টিকে ত্রুটিমুক্ত করে প্রশ্নের সমাধান দেন। তিনি বলেন যে এই কণা-তরঙ্গ প্রকৃতপক্ষে একাধিক তরঙ্গের (সূর্যের আলোর মতোই)। কিন্তু কণাতরঙ্গের বিভিন্ন তরঙ্গকে কখনোই আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ কণাতরঙ্গ সর্বদাই তরঙ্গের গোষ্ঠী বা ওয়েভ গ্রুপ। এমন ওয়েভ গ্রুপ তা হলে কার প্রকাশ? এমন ওয়েভ গ্রুপ হল সময়ের সাপেক্ষে কণাটির পরিবর্তনশীলতার একাধিক ধরনের সম্মিলন। অর্থাৎ ওয়েভ গ্রুপ কণাটির পরিবর্তনশীলতাকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

আমরা বিভিন্ন তরঙ্গের (আলাদা আলাদা কৌনিক কম্পাঙ্ক এবং আলাদা আলাদা ওয়েভ নাম্বার-এর) সমাপতন বা সুপার পজিশনের ফলে যে লব্ধী তরঙ্গ পাই, তাতে কোথাও কোথাও তরঙ্গের ঢেউগুলো খুব ওঠা-নামা করে। আবার কোথাও কোথাও শান্ত সরলরৈখিক পাই।

প্রথমের গাণিতিক ব্যাখ্যায় না গিয়ে পরিচিত উদাহরণে যাওয়া যাক। শান্ত পুকুরের টলটলে জলে একটা ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। একই সঙ্গে দুটি ঢিল ছুড়লে, তারা জলে পড়ার পর দেখা যায় কোথাও একটা ঢেউ যে উচ্চতা একা এক উঠতো, তার চেয়েও আরো উঁচুতে উঠছে। আবার কোথাও একা হলে যত না নামতো, তার চেয়েও বেশি নিচে নামছে। এখানে যে ঘটনা ঘটছে, তা হল একাধিক ঢেউ-এর সুপারপজিশন। কয়েকটা ছবির সাহায্যে বিষয়টা সহজে বোঝা যায়। (চিত্র-১, চিত্র-২)

দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা কম্পাঙ্কের সুপারপজিশন বা সমাপতন চিত্র-১-এ লব্ধী তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে চিত্র-১-এ। আবার বিপরীত ঘটনা হয়েছে চিত্র-২-তে, যেখানে প্রথম তরঙ্গ ও দ্বিতীয় তরঙ্গে প্রকৃতি বিপরীত।

কণা তরঙ্গের ক্ষেত্রেও তাতে উপস্থিত এক একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সমাপতনের ফলে সময়ের সাপেক্ষে আমরা কখনো চিত্র-১ এর অনুরূপ অবস্থা পাবো, কখনো চিত্র-২ এর অনুরূপ অবস্থা পাবো।

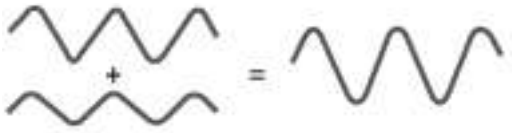

চিত্র-১

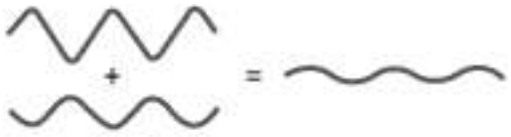

চিত্র-২

যেখানে চিত্র-১ এর অনুরূপ অবস্থা পাবো এবার থেকে কণাটিকে সেখানেই খুঁজতে হবে। অর্থাৎ ওয়েভ প্যাকেটেই কণাটিকে পাবো। এটা কিভাবে বলতে পারি? এর জন্য বাধ্য হয়েই কিছু গাণিতিক হিসাবে যেতে হচ্ছে।

ধরা যাক দুটি মাত্র তরঙ্গের সমীকরণ আছে। প্রথমটির ওয়েভ ফাংশান $y_1 = ACos(wt - kx)$

[এখানে y_1 অক্ষ বরাবর তার অ্যামপ্লিচুড বা বিস্তারকে সময়ান্তরে নির্ণয় করা হয়েছে, যার সর্বাধিক বিস্তার A]

একইভাবে $y_2 = ACos\left[(w+\Delta w)t - (k+\Delta k)x\right]$ অপর তরঙ্গের সমীকরণ উভয় তরঙ্গেরই সর্বোচ্চ বিস্তার (amplitude) A

প্রথম তরঙ্গের কৌনিক কম্পাঙ্ক $w = 2\pi\nu$; ওয়েভ নাম্বার $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

এর ক্ষেত্রে তরঙ্গের বেগ (ফেজ ভেলোসিটি) $v_p = \nu\lambda = \frac{w}{2\pi}.\frac{2\pi}{k} = \frac{w}{k}$ দ্বিতীয় তরঙ্গের কৌনিক কম্পাঙ্ক Δw এবং ওয়েভ নাম্বার Δk বৃদ্ধি করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য চিত্র-৩]

এই দুইটি তরঙ্গের লব্ধী (resultant) $y = y_1 + y_2$ এখন এই যোগফল নির্ণয় করতে দুটি ত্রিকোণমিতির সূত্র

$$Cos\,\alpha + Cos\,\beta = 2\,Cos\frac{1}{2}(\alpha+\beta).Cos\frac{1}{2}(\alpha-\beta)$$

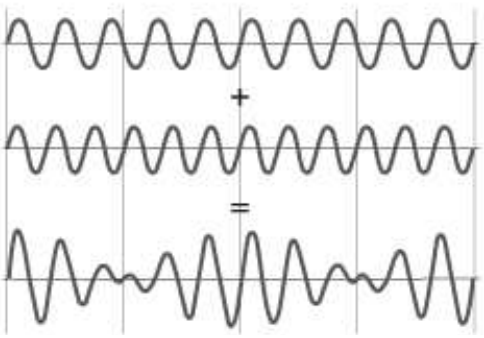

চিত্র-৩

এবং $Cos(-\theta) = Cos\,\theta$ কে ব্যবহার করে পাওয়া যায়

$$y = 2A\,Cos\frac{1}{2}[(2w+\Delta w)t-(2k+\Delta k)x]\,Cos\frac{1}{2}(\Delta wt-\Delta kx)$$

[এই গাণিতিক নির্ণয় উৎসাহী পাঠকরা উপরি উক্ত ত্রিকোণমিতির সূত্রকে ব্যবহার করে নির্ণয় করে নিতে পারেন]

এখন Δw এবং Δk যদি w এবং k এর তুলনায় অতিক্ষুদ্র হয় তবে $2w+\Delta w \approx 2w$ এবং $2k+\Delta k \approx 2k$ হবে।

তখন $y = 2A\,Cos\frac{1}{2}(2wt-2kx)\,Cos\,1/2(\Delta wt-\Delta kx)$

$$= 2A.\,Cos(wt-kx).\,Cos\left(\frac{\Delta w}{2}.t-\frac{\Delta k}{2}x\right)$$

হবে।

এই শেষোক্ত লব্ধী সমীকরণ প্রকাশ করে একটি তরঙ্গকে যেখানে কৌনিক কম্পাঙ্ক w এবং ওয়েভ নাম্বার k অপর একটি তরঙ্গের সঙ্গে সুপারপজিশন বা সমাতপতনের ফলে কৌনিক কম্পাঙ্কের modulation হয়েছে $\frac{\Delta w}{2}$ এবং ওয়েভ নাম্বারের modnlation হয়েছে $\frac{\Delta k}{2}$ ।

এই ওয়েভ সমীকরণে প্রথম তরঙ্গের গতিবেগ v_p হলে সেই তরঙ্গের গতিবেগ হল $v_p = \nu\lambda = \frac{w}{k}$ এবং লব্ধী তরঙ্গের গতিবেগ $v_g = \frac{\Delta w/2}{\Delta k/2}$ বা $v_g = \frac{\Delta w}{\Delta k}$ । যখন এই কৌনিক কম্পাঙ্ক এবং ওয়েভ নাম্বারের পরিবর্তন কণাতরঙ্গের ক্ষেত্রে অসীমতর ক্ষুদ্র (infinitely small) হবে, তখন ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস অনুসারে $v_g = \frac{dw}{dk}$ হবে।

এখন $w = 2\pi\nu = \frac{2\pi\gamma mc^2}{h} = \frac{2\pi mc^2}{h\sqrt{1-v^2/c^2}}$...(1)

আবার $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\gamma mv}{h} = \frac{2\pi mv}{h\sqrt{1-v^2/c^2}}$...(2)

অথাৎ w এবং k উভয়ই কণার গতিবেগ v এর সমীকরণ।

এখন $v_g = \frac{dw}{dk} = \frac{\frac{dw}{dv}}{\frac{dk}{dv}}$

এখন সমীকরণ (1) এবং (2) থেকে উভয় পক্ষে v এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যথাক্রমে পাই

$$\frac{dw}{dk} = \frac{2\pi mv}{h(1-v^2/c^2)^{3/2}}$$

এবং $\frac{dk}{dv} = \frac{2\pi m}{h(1-v^2/c)^{2\,3/2}}$

$$v_g = \frac{\frac{2\pi mv}{h(1-v^2/c^2)^{3/2}}}{\frac{2\pi m}{h(1-v^2/c^2)^{3/2}}} = v$$

অর্থাৎ লব্ধী তরঙ্গের গতিবেগই হল কণাটির গতিবেগ। এখন থেকে আমরা সময়ের সাপেক্ষে গতিশীল কণাতরঙ্গের লব্ধী তরঙ্গের যে ওয়েভ প্যাকেট পাবো যা সময়ান্তরে বারে বারে ফিরে ফিরে আসে, তার মধ্যেই কণাটিকে পাবো। কারণ একদিকে ডে ব্রগলির তরঙ্গ কণাটির সঙ্গে চলে (associeted wave) এবং অন্যদিকে এই ওয়েভ প্যাকেটের গতিবেগ v_g এবং কণাটির গতিবেগ v সমান।

ডে ব্রগলির তরঙ্গ কি আপেক্ষিকতাবাদকে অস্বীকার করে?

শ্রয়ডিঙ্গারের ভাবনা আমাদের নতুন যে ধারণা দিয়েছে, তাকে বস্তু কণার সাথে চলা তরঙ্গ (associaeted wave) এখন আর কেবলমাত্র একটি তরঙ্গ নয়, সে অনেকগুলো তরঙ্গের একত্রিতরূপ বা ওয়েভ প্যাকেট। আমরা যদি ভুল বশত এই তরঙ্গগুলির কোনো একটিকে আলাদা করে গাণিতিক সূত্রে প্রয়োগ করি (যেমন এক্ষেত্রের প্রথম তরঙ্গ সমীকরণের ফেজ ভেলোসিটি v_p কে ধরি) তবে

$$v_p = \frac{w}{k} = \frac{2\pi\gamma mc^2/h}{2\pi\gamma mv/h} = \frac{c^2}{v}$$ ই হবে।

যেখানে গাণিতিকভাবে বলা যাবে আপেক্ষিকতাবাদ অস্বীকৃত হচ্ছে। **কিন্তু যেহেতু এভাবে কণাতরঙ্গে কখনোই আলাদা আলাদা তরঙ্গকে পৃথকীকরণ করা যাবে না, সর্বদা তার সুপারপজিশন হয়েই উপস্থিতি থাকবে, সেকারণে কণাতরঙ্গের ফেজ ভেলোসিটির কোনো বাস্তব তাৎপর্য নেই। আমরা সব সময় তার গ্রুপ ভেলোসিটিকেই** (v_g) **পাবো কেবলমাত্র।** এই $v_{g=v}$ হওয়ায় তা সব সময়ই আলোর গতিবেগের কমই হবে। অর্থাৎ ডে ব্রগলির তরঙ্গের গতিবেগ আপেক্ষিকতাবাদকে অস্বীকার করে না।

একটি গতিশীল কণাকে অনেকগুলি কণাতরঙ্গের গ্রুপ হিসেবে স্বীকৃতি দিলে বলা যায় এই কণার অবস্থান ও তার ভরবেগ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় সম্ভব নয়, তা হবে সর্বদা ত্রুটিপূর্ণ। একটি ওয়েভ গ্রুপকে নজর করলে, কোনো সময়ে তার মধ্যে যে কোনো স্থানে কণাটির অবস্থান হতে পারে। এই ওয়েভ গ্রুপের মাঝখানে সর্বোচ্চ সম্ভাব্যতা, যাকে ইতিমধ্যে আমরা বলেছি প্রবাবিলিটি ডেনসিটি $|\Psi|^2$। তাই বরা যায় কণাটিকে খুব সম্ভবত সেখানেই পাওয়া যাবে। তবে অন্যত্রও পাওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। এই ওয়েভ গ্রুপটি যত সংকীর্ণ হবে তত নিখুঁতভাবে কণাটির অবস্থান বলা যাবে। যদিও সংকীর্ণ ওয়েভ প্যাকেটে থাকা তরঙ্গগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ভালোভাবে নির্ণয় করা যাবে না; অর্থাৎ সেখানে থাকবে না যথেষ্ট সংখ্যক তরঙ্গ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য। এর অর্থ যেহেতু $\lambda = h/\gamma mv$, কণাটির ভরবেগ γmv হবে না সঠিকভাবে নির্নীত পরিমানের।

অন্যদিকে এক বিস্তীর্ণ তরঙ্গ গ্রুপে, যেখানে অনেকগুলো তরঙ্গ সংখ্যা থাকবে, অনেক বেশি পরিস্কারভাবে নির্দেশিত (defined) তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে। ফলে সেখান থেকে অনেকগুলো ভরবেগ (γmv) -র মান নির্ণয় সম্ভব হবে এবং এর অনেকগুলো মান থেকে এক প্রায় সুনিশ্চিত কণাটির ভরবেগ নির্ণয় করা যাবে। কিন্তু কোথায় কণাটি রয়েছে? এই বিস্তীর্ণ তরঙ্গ গ্রুপে কোথায় কণাটি থাকার সম্ভাবনা আছে তা বলা মুস্কিল হবে।

ওয়েভ গ্রুপ

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি
(বস্তুকণার তরঙ্গ ধর্ম থেকে)

আমরা কস্তুকণার তরঙ্গধর্মকে মেনে নিলে, তার অনেকগুলি তরঙ্গের সুপার পজিশনকে মেনে নিলে, অর্থাৎ তার ওয়েব গ্রুপকে মেনে নিলে এবং ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশন সম্পর্কে ম্যাক্সপ্লাঙ্কের বাস্তবিক পরীক্ষালব্ধ ফল থেকে প্রাপ্ত প্লাঙ্ক ধ্রুবক h কে মেনে নিলে (যা অন্যতম সার্বজনীন ধ্রুবক বলে স্বীকৃত) বস্তুকণার অবস্থান ও ভরবেগের অনিশ্চয়তার নীতিকে মানতে হয়।

এমনই এক প্রস্তাবনা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে (অর্থাৎ ডে ব্রগলির কণা তরঙ্গের পাথুরে প্রমাণ যে বছর পাওয়া গেছিল) হাজির করেন জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ। তিনি বলেন বস্তুকণার একেবারে নিখুঁত অবস্থান এবং নিখুঁত ভরবেগ কখনোই একত্রে জানা সম্ভব নয়। **এটা কোনো নেতিবাচক উক্তি নয়। এটা মূলগতভাবে প্রকৃতিরই নিয়ম। কিন্তু এক একটি বস্তুকণা যখন এতটাই ছোট যে তাকে আমরা অনুসন্ধান করছি এক একটি ওয়েব গ্রুপের মধ্যে, এমন অবস্থায় এই নিয়মটা স্পষ্ট হয়।**

আমরা [চিত্র ৩] এ দুটি তরঙ্গের সুপার পজিশন দেখেছিলাম। এবার যদি অসীম সংখ্যক তরঙ্গের এমন ওয়েভ গ্রুপ ধরা হয়, যার মধ্যকার তরঙ্গগুলির কম্পাঙ্ক, ওয়েভ নাম্বার (k) এবং অ্যামপ্লিচুড বা বিস্তার আলাদা আলাদা হয়, তবে এদের ওয়েভগ্রুপটি কেমন হবে তা [চিত্র-৫]-এ দেখানো হল।

কোনো নির্দিষ্ট সময় t তে ওয়েভ গ্রুপ $\psi(x)$ কে প্রকাশ করা হয় গণিতজ্ঞ ফুরিয়ারের বিখ্যাত ফুরিয়ার রূপান্তর দ্বারা।

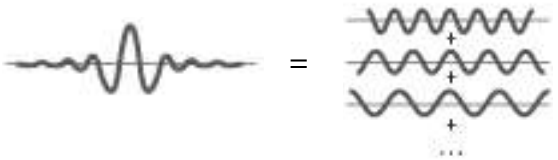

চিত্র-৫

এই ফুরিয়ার রূপান্তরকে ব্যবহার করে ওয়েভ ফাংশানকে এক রূপ (time domain) থেকে অন্যরূপে (frequencey domain)-এ রূপান্তরিত করা হয়। এখানে আমরা ওয়েভ ফাংশান ψ কে ওয়েভ গ্রুপের ওয়েভ নাম্বারের ফাংশানে রূপান্তর করতে পারি। এর ফলে যে সমীকরণটি পাওয়া যায় সেটি হল

$$\psi(x) = \int_0^{\alpha} g(k)\, Cos\, k\, x\, d\, k$$

এই সমীকরণে বাঁদিকের অংশকে একটি লেখচিত্রে প্রকাশ করলে তার অনুভূমিক অক্ষে সময়ের সাপেক্ষে কণার অবস্থান x এর মান পাবো। এছাড়া উল্লম্ব অক্ষে ওয়েভ ফাংশান ψ এর মান বসিয়ে বিভিন্ন ওয়েব গ্রুপের লেখচিত্র পাবো।

আবার $g(k)$ প্রকাশ করে ওয়েব নাম্বারের সাপেক্ষে তরঙ্গের বিস্তার রূপকে। এটি $\psi(x)$, ওয়েভব নাম্বার k এর পরিবর্তনের সাথে কিভাবে পাল্টায় তা তুলে ধরে। এই $g(k)$ নামক ফাংশানকে $\psi(x)$ এর রূপান্তরিত করলে তাকে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম বলে। [চিত্র-৬]

এই ফুরিয়ার রূপান্তরের প্রয়োজন হয়েছে এই জন্য যে সমীকরণের বাঁদিকে যেমন কণাটির অবস্থান পাবো, তেমনি ডানদিকের অংশে পাবো তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য (কারণ ওয়েভ নাম্বার $k = \frac{2\pi}{\lambda}$)। একই সময়ে কণাটির অবস্থান যখন নির্ণয় করবো, সেই মুহূর্তে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে তার ভরবেগও নির্ণয় করা যাবে (কারণ $\lambda = \frac{h}{p}$ যেখানে $p =$ ভরবেগ)

খুব নিখুঁতভাবে বললে ওয়েভ নাম্বার (k) এমন ওয়েভগ্রুপকে প্রকাশ করে যেখানে k এর নাম শূন্য (0) থেকে অসীম (α) পর্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে $g(k)$ ফাংশানটির ইন্ট্রিগাল [সম্পূর্ণরূপ] টি হিসাব করতে হবে সমাকলনের মাধ্যমে শূন্য (0) থেকে অসীম (α) লিমিট ধরে। এটি গণিতবিদ ফুরিয়ারের নামাঙ্কিত ফুরিয়ার ইন্টিগ্রাল। কিন্তু যে গ্রুপের দৈর্ঘ্য Δx অসীম, সেখানে $g(k)$ ফাংশানে থাকা ওয়েভ নাম্বার Δk এর মান অসীম হবে। (অর্থাৎ ফুরিয়ার রূপান্তরের সময় যদিও ওয়েভ গ্রুপগুলির সীমা অসীম হবে, তার ক্ষেত্রে ওয়েভ নাম্বারও অসীম হবে।

চিত্র-৬ থেকে দেখা যাচ্ছে যত ওয়েভ গ্রুপটি সংকীর্ণ হচ্ছে তত বিস্তীর্ণ ওয়েভ নাম্বার দরকার হচ্ছে [চিত্র-৬(ক)] তাকে ব্যাখ্যা করতে। ওয়েভ গ্রুপটি যত বিস্তীর্ণ হবে, তত সংকীর্ণ ওয়েভ নাম্বার দরকার হবে। [চিত্র-৬(গ)]

ওয়েভ গ্রুপের দৈর্ঘ্য Δx এবং ওয়েভ নাম্বার Δk এর সম্পর্ক নির্ভর করে গ্রুপের আকারের উপর এবং কিভাবে Δx এবং Δk কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার উপর। Δx এবং Δk এর গুণফলের মান ক্ষুদ্রতম হবে যখন ফাংশানটি ঘন্টা আকৃতির গসিয়ান ফাংশান হবে [চিত্র-৬(ঘ)] $\psi(x)$ এবং $g(k)$ ফাংশান দুটির লেখচিত্রে Δx এবং Δk যথাক্রমে দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য ত্রুটি।

এই স্টান্ডার্ড ডেভিয়েশন হল কোনো লেখচিত্রে যেখানে একটি চলরাশির সর্বাধিক সম্ভাবনা রয়েছে, বাস্তবিক তা আমরা সব সময় পাই না। সর্বাধিক সম্ভাবনার থেকে যে স্ট্যান্ডার্ড মানটি কম বা বেশি পাবো, সেটাই তার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। আমরা কণাতরঙ্গের এই লেখচিত্রদ্বয় থেকে দেখেছি যে যখন Δx মান বাড়ছে তখন Δk এর মান কমছে। একমাত্র গসিয়ান ফাংশান [চিত্র-৬ (ঘ)] Δx এবং Δk এর গুণফল সর্বনিম্ন এবং তা $\frac{1}{2}$। যেহেতু ওয়েভগ্রুপটি সাধারণত এমন চেহারার হয় না তাই বাস্তবে $\Delta x.\Delta k \geq \frac{1}{2}$ লেখা যাবে। এই সম্পর্ক গসিয়ান ফাংশানে সহ অন্য সমস্ত ফাংশানে প্রযোজ্য।

এখন ডে ব্রগলির তরঙ্গের ভরবেগ p হলে $\lambda = \frac{h}{p}$

আবার $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\, p}{h}$ বা, $p = \frac{hk}{2\pi}$। এখন ওয়েভ নাম্বারের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন Δk হলে তার সঙ্গে সম্পর্কিত ভরবেগের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন Δp হবে এবং $\Delta p = \frac{h\Delta k}{2\pi}$

যেহেতু আমরা বাস্তবে $\Delta x.\Delta k \geq \frac{1}{2}$ পেয়েছি, তাই

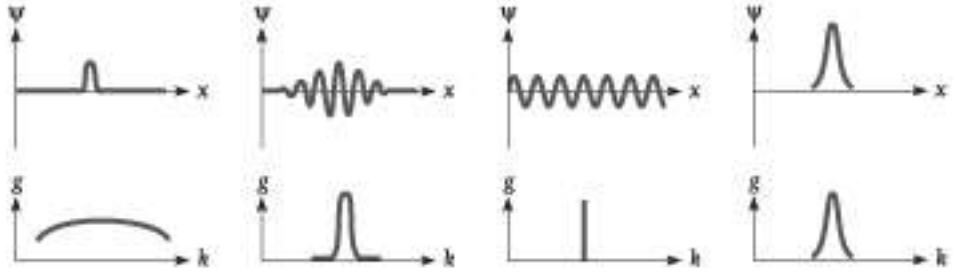

(ক) (খ) (গ) (ঘ)

Figure 3.14 The wave functions and Fourier transforms for (*a*) a pulse, (*b*) a wave group, (*c*) a wave train, and (*d*) a Gaussian distribution. A brief disturbance needs a broader range of frequencies to describe it than a disturbance of greater duration. The Fourier transform of a Gaussian function is also a Gaussian function.

চিত্র-৬

$$\Delta k \geq \frac{1}{2\Delta x}$$

$$\therefore \Delta x.\Delta p \geq \frac{\Delta x.h}{2\Delta x.2\pi} \text{ বা, } \Delta x.\Delta p \geq \frac{h}{4\pi}$$

অর্থাৎ যদি ওয়েভ গ্রুপটি সংকীর্ণ হয়, তবে তার কণার ভরবেগ হবে খুবই অনির্দিষ্ট। বিপরীতক্রমেও বিষয়টা তাই। একে প্রচলিতভাবে বললে কোনো বস্তুকণার অবস্থান যত সুনিশ্চিত হবে তত তার ভরবেগ হবে অনিশ্চিত। আবার বস্তুকণার ভরবেগ যত সুনিশ্চিত হবে তত তার অবস্থান সুনিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। এই অনিশ্চয়তাই হাইজেনবাগের অনিশ্চয়তা নীতি।

যদি $h/2\pi$ কে $\hbar$ ধরা হয় যার মান $1.054\times10^{-34} J.s$

তবে $\Delta x.\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ হবে।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি (বস্তুর কণা ধর্ম থেকে)

বস্তুর তরঙ্গ ধর্ম (wave nature) এবং কণা ধর্ম (particle nature) কে বলেছিলাম বস্তুতে থাকা অবিচ্ছিন্ন বৈপরীত্ব। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির মতো। প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা এই প্রাকৃতিক নিয়ম কণাটিকে তরঙ্গরূপে না দেখে কণারূপে দেখলেও সত্য হয়।

এই প্রসঙ্গে একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করা যাক। কোনো বস্তুকণার অবস্থান এবং ভরবেগ কোনো এক মুহূর্তে পরিমাপ করতে গেলে আমাদের এমন কিছু দিয়ে তাকে আঘাত করতে হবে যা ঐ তথ্য (information) আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেবে। সেটা তাকে আঘাত করে বা তার উপর আলো ফেলে হতে পারে বা সমধর্মী কোনো কাজ করে।

ধরা যাক আমরা একটি ইলেকট্রনের দিকে তাকালাম। তাকে দেখার জন্য তার উপর ধরা যাক λ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ফেলা হল। এই আপতিত আলোর প্রতিটি ফোটনের ভরবেগ h/λ। যখন এদের কোনো একটি ইলেকট্রনে ধাক্কা লাগে, তখন তা ধাক্কা খেয়ে আমাদের চোখে ফিরে আসে বা প্রতিফলিত হয়। তবেই আমরা তাকে দেখতে পাবো। কিন্তু ফোটনের আঘাতে ইলেকট্রনের ভরবেগ বদলে যাবে। এই ভরবেগের পরিবর্তন Δp আগে থেকে বলা যাবে না। কিন্তু এটা ফোটনের ভরবেগের সাথে পরিবর্তিত হবে। সুতরাং $\Delta p \approx \frac{h}{\lambda}$...(3)

যদি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ) বৃদ্ধি পায়, তবে ভরবেগের পরিবর্তন Δp হ্রাস পাবে। অর্থাৎ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সাথে ইলেকট্রন কণার ভরবেগের অনিশ্চয়তা হ্রাস পাবে।

যেহেতু আলোর তরঙ্গ ধর্ম এবং কণা ধর্ম রয়েছে, তাই আমরা আশা করতে পারি না ইলেকট্রনের অবস্থান নির্ণয় সঠিকভাবে করতে পারবো। এর জন্য যান্ত্রিক ত্রুটি কোনো কারণ নয়। যুক্তিযুক্তভাবে বলা যায় এই অবস্থান নির্ণয়ের অনিশ্চয়তার পরিমাণ একটি ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিমাণ হতে হবে। সুতরাং $\Delta x \geq \lambda$ হবে বাস্তব। এক্ষেত্রে ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হবে ইলেকট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তাই

তত কম হবে। অথচ ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার ফলে কণাটির ভরবেগের অনিশ্চয়তা বাড়বে।

ফোটনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হলে কণাটির অবস্থানের অনিশ্চয়তা বাড়বে, কিন্তু তার ভরবেগের অনিশ্চয়তা কমবে। উপরি উক্ত অসমীকরণকে একত্রিত করে বলা যায়

$\lambda \approx \frac{h}{\Delta p} \therefore \Delta x \geq \frac{h}{\Delta p}$ বা, $\Delta x.\Delta p \geq h$, এই অসমীকরণটি $\Delta x.\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ এর প্রায় একই প্রকৃতির। **সুতরাং বস্তুকে কণা বা তরঙ্গ যাই বলি হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা কার্যকরী।**

বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অপর্যাপ্ত যন্ত্রপাতির কারণে কার্যকর নয়, বরং প্রকৃতির অসম্পূর্ণ চরিত্রের কারণে, Δx এবং Δp এবং গুণফলের মান বৃদ্ধি পেতে পারে বড়জোড় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। তার অধিক কিছু নয়। যেহেতু আমরা কোনো কণার অবস্থান একেবারে নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে পারছি না এবং এর ভরবেগ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে পারছি না, তাই আমরা ভবিষ্যৎ কণাটি কোথায় থাকবে বা তখন সে কত দ্রুত চলবে আমরা বলবে পারবো না। তাই আমরা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যৎকে জানতে পারি না কারণ বর্তমানেই তাকে নিশ্চিতভাবে আমরা জানতে পারি নি। কিন্তু আমাদের অগ্রাহ্যতা সামগ্রিক নয়। আমরা এখনো বলতে পারি বস্তুকণাটি খুব সম্ভবত কোনো এক নির্ধারিত স্থানে আছে। ভরবেগের ক্ষেত্রেও তাই।

অতিক্ষুদ্র কণার ক্ষেত্রে এই অবস্থান ও গতি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা যে রকম গুরুতর হয়, আমাদের চোখে দেখা পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকা জগতে থাকা বস্তুর ক্ষেত্রে তা তেমন গুরুতর নয়, এর দুটো উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথম উদাহরণে একটি প্রোটন কণার সঠিকতার সীমা $\Delta x_0 = \pm 1.00 \times 10^{-11} m$ এক সেকেন্ডে তার অনিশ্চয়তার পরিমাণ আমরা নির্ণয় করবো।

ধরি প্রোটনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা Δx_0 (যখন সময় $t = 0$)। এই সময় তার ভরবেগের অনিশ্চয়তা হবে $\Delta p \geq \frac{\hbar}{2\Delta x_0}$, যেহেতু প্রোটনের গতিবেগ $v \ll$ আলোর গতিবেগ (c)। তাই $\Delta p = \Delta(mv) = m\Delta v$, সুতরাং প্রোটনের গতিবেগের অনিশ্চয়তা $\Delta v = \frac{\Delta p}{m} \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x_0}$।

যদি প্রোটন কণাটি t সময়ে x দূরত্ব যায়, তবে তাতে Δx পরিমাণ ত্রুটি থেকে যাবেই।

এই $\Delta x = t\Delta v \geq \frac{\hbar.t}{2m\Delta x_0}$

$$\therefore \Delta x \geq \frac{(1.054\times10^{-34} J.s)\times(1.00s)}{(2)(1.672\times10^{-27} kg)(1.00\times10^{-11} m)} = 3.15\times10^{3} m$$

≈ 2 মাইল।

এখন প্রোটন কণার বদলে যদি একটি $100 gm$ ভরের টেনিস বলের এক সেকেন্ড পরে অবস্থান আমাদের খালি চোখে মাপি। তখন তার দূরত্ব মাপার স্কেলের সঠিকতার সীমা ধরি $0.5mm$, বলটি যদি $100 km/hr.$ বেগে গতিশীল হয় তবে এক্ষেত্রে তার দূরত্ব মাপতে গিয়ে ত্রুটি

$$\Delta x \geq \frac{(1.054\times10^{-34} J.s)(1.00s)}{(2)(0.1kg)(0.0005m)}$$
$$= 1.054\times10^{-30} m = 1.054 \Big/ 10^{27} mm$$

অর্থাৎ মানুষের চোখে কেন কোনো আধুনিক যন্ত্রেও এই ত্রটি ধরা পড়বে না। এই ত্রুটি প্রকট হবে কেবলমাত্র কণাটির অতিক্ষুদ্র ভরের জন্য অর্থাৎ তার **অতিক্ষুদ্র আকারের জন্য।** একারণেই এই ত্রুটির কারণ প্রকৃতির অসম্পূর্ণ চরিত্র। এ কারণে পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘূর্ণনরত ইলেকট্রনের কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে আসলে বলা যায় না, যা বিজ্ঞানী নীলস্ বোর তাঁর প্রকল্পে বলেছিলেন। ইলেকট্রনের সম্ভাব্য উপস্থিতি কোথায় তা বড় জোড় বলা যায় এবং তা বোরের মতানুযায়ী দ্বিমাত্রিক বৃত্তাকারও নয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকা অস্থির ইলেকট্রন কনার অবস্থান ও গতিময় অবস্থা জানাটা অনিশ্চিত হলেও তার সম্ভাব্য উপস্থিতি ও ভরবেগ নির্ণয় করাটাই এখন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো। সেভাবেই আমরা পরমাণুতে উপস্থিত ইলেকট্রনের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে যে আন্দাজ পাবো, তা ব্যবহার করেই রসায়ন বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। (ক্রমশ)

সংগঠন সংবাদ

পরিবেশ দিবস নিয়ে প্রচার

গত ৫ই জুন ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই উপলক্ষ্যে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয় এবং রাজ্যের সর্বত্র তা প্রচার করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই উপলক্ষ্যে পোস্টারিং হয়। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ও গোপালনগর গ্রামে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলে, হাওড়া জেলার আমতা এলাকায় ঐদিন ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ই জুন পুরুলিয়া শহরে সদস্য ও পাঠকদের নিয়ে আলোচনা সভা হয়। ১৫ই জুন বেহালা ঠাকুরপুকুরে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে প্লাস্টিক দূষণ ও সমাধান শীর্ষক সেমিনার হয়। ৫ই জুন উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁতে এবং বারাসাতে পরিবেশ দিবস নিয়ে প্রচার হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচরণ এলাকায় তিনটি কোচিং সেন্টার এবং সোনারপুর স্টেশনে জনতার মধ্যে প্রচার করা হয়।

কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শন

গত ২৫শে মে, কলকাতার বেহালা সিঁড়িটি অঞ্চলে স্থানীয় ক্লাবে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গ-র বেহালা-ঠাকুরপুকুর শাখা একটি কুসংস্কার বিরোধী এবং অলৌকিকতাবাদ বিরোধী প্রদর্শনী করে। কয়েক শতাধিক জনতার মধ্যে এই অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

নির্দোষ চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনের সমর্থনে

সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনে আমরা বিভিন্ন সময় অংশগ্রহণ করেছি। চাকরিহারা নির্দোষ শিক্ষকদের উপর বর্বর পুলিশী হামলার বিরুদ্ধে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পোস্টারিং করা হয়। গত ১৫ই মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরের বৈকুণ্ঠপুর মোড় এবং নরেন্দ্রপুর স্টেশনে সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি এবং এআইপিএসএফ-এর আয়োজিত সভায় আমাদের প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

ধর্মবিদ্বেষী প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল

গত ১২ই মে ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে সখেরবাজার অবধি একটি ধর্মবিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক প্রচারের বিরুদ্ধে সংহতি সভা ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। অভয়া মঞ্চের অংশীদার সংগঠন বেহালা প্রতিবাদী মঞ্চ এই কর্মসূচি গ্রহণ করে। আমাদের সংগঠন বিভিন্ন সুদৃশ্য প্ল্যাকার্ডসহ এই মিছিলে অংশ নেয় এবং একজন প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলা ও যুদ্ধ জিগির বিরোধী প্রচার

গত ২২শে এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে নৃশংস সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে এবং তার পরবর্তীতে যুদ্ধ জিগিরের বিরুদ্ধে সংগঠন প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারির পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পোস্টারিং কর্মসূচি পালন করে।

মে দিবস উদ্‌যাপন

আয়োজক কমিটির অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রমিক, ছাত্র ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস পালন করা হয়।

অভয়া'র ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলন

প্রতি মাসের ৯ তারিখের মত গত ৯ই এপ্রিল, ৯ই মে এবং ৯ই জুন অভয়া'র ন্যায়বিচারের দাবিতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভায় আমাদের কর্মীরা উপস্থিত থেকেছেন। ■

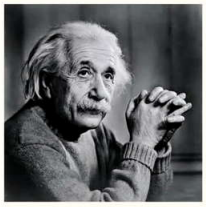

"দিনে শতবার আমি নিজেকে এ কথাই স্মরণ করাই যে, আমাদের গোটা জীবনটাই নির্ভর করে আছে অপরের শ্রমের উপর; তাঁদের কেউ জীবিত বা মৃত এবং তাঁদের কাছ থেকে যা আমি পেয়েছি এবং আজও পাচ্ছি, ঠিক সমানভাবেই তার প্রতিদান আমাদের অবশ্যই দিতে হবে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করছি, তা অন্যরা উৎপাদন করছেন। যে বস্ত্র পরিধান করি, তাও অপরের তৈরি। যে ঘরে বাস করি, অপরেই তা নির্মাণ করে। অপরের দ্বারা জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রায় সমস্ত অংশের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটেছে ভাষার মধ্য দিয়ে যে ভাষা অপরেই সৃষ্টি করেছে"

আলবার্ট আইনস্টাইন

ছড়া ঃ

মাস হিস্টিরিয়া

– তন্ময়

যুদ্ধ জিগির, ফন্দিফিকির, মাস হিস্টিরিয়া
লাফায়, ঝাপায়, ব্যবসা বাড়ায় হরেক মিডিয়া,
ছিন্নভিন্ন দেশের ‘পরে ক্যামেরা তাক করে
টিআরপি’র রোলার চালায় দিবারাত্র জুড়ে
দেশপ্রেমের মুখোশ পরে দ্বেষপ্রেমীদের দলে
ফেক নিউজের রমরমা আর ঘৃণা ভাষণ চলে,
চায়ের ভাঁড়ে কায়দা করে চুমুক খানি দিয়ে
হিংসা ছড়ায়, বিভেদ বাড়ায়, জাত ধর্ম নিয়ে,

সীমান্তে যারা যুদ্ধ করে, যুদ্ধ চায় না তারা
প্রতি মুহূর্তে জীবনযুদ্ধে কোটি সর্বহারা
রক্ত নিশান, মুক্তির গান, লড়াই হার না মানা
চিন্তায় শান, হবে অবসান যুদ্ধ উন্মাদনা।

১২ই মে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও যুদ্ধ জিগিরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল

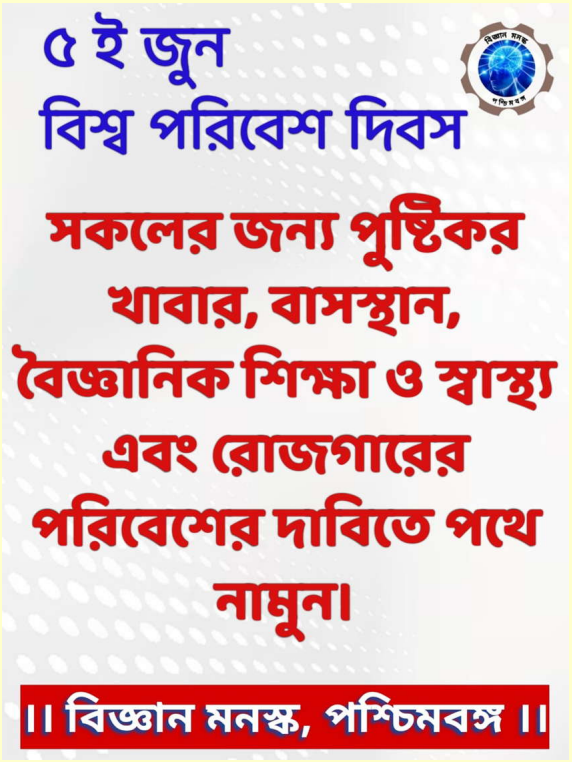

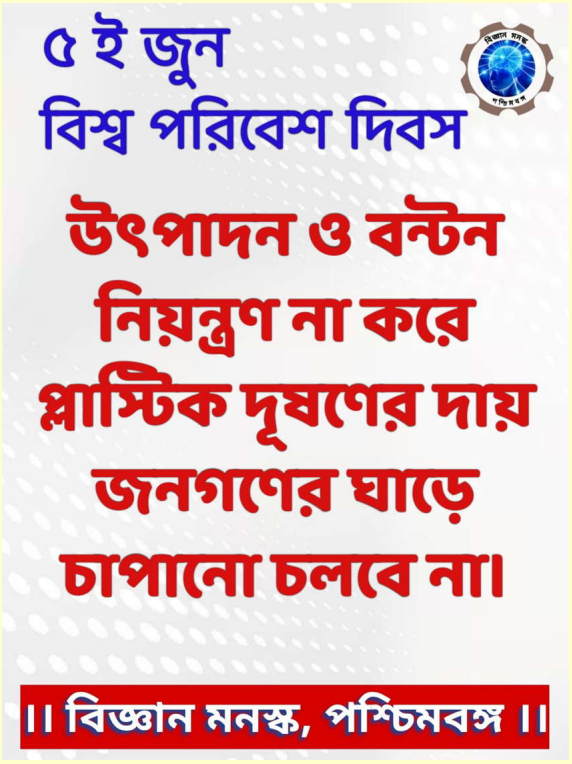

সহযোগিতা রাশি ঃ ১৫.০০ টাকা

Registration No.: SO197407 of 2012-13

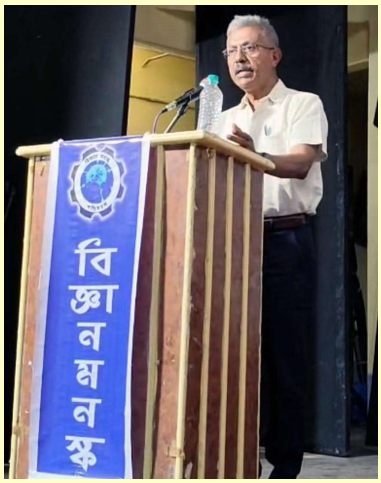

চতুর্থ কেন্দ্রীয় প্রকাশ্য সম্মেলনে
ডাঃ অশেষ রায় চৌধুরী (ত্রিপুরা যুক্তিবাদ বিকাশ মঞ্চ)

চতুর্থ কেন্দ্রীয় প্রকাশ্য সম্মেলনে
ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ

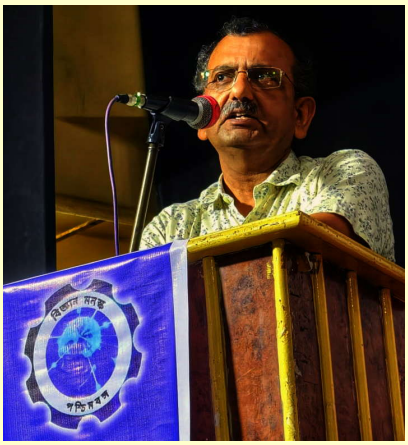

চতুর্থ কেন্দ্রীয় প্রকাশ্য সম্মেলনে
ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার (পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট)

৭ই জুন পুরুলিয়ায় পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে সেমিনার

৫ই জুন হাওড়া আমতায় পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা

৫ই জুন পাথরপ্রতিমায় পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা

৫ই জুন লক্ষ্মীকান্তপুরে পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে তন্ময় দাশগুপ্ত, ৮৮/৩ ভট্টাচার্য পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০৬৩
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : https://samikshan.org